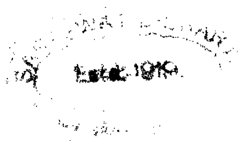
সাহিত্য-পরিচয়

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত



মিত্র এণ্ড ঘোষ
১০নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—আড়াই টাকা—

মিত্র এণ্ড ঘোষ, ১০নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও কালিকা প্রেস, ২৫নং ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১৯২৭

ভূমিকা

যে কয়টি প্রবন্ধ এখানে ছাপা হইল তাহা নানা সময়ে পূর্ব্বে প্রবাসী, বিচিত্রা প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কৌতুকরসের জন্মকথা প্রবন্ধটি বোধ হয় প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই কাব্য-সমালোচনা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া আসিয়াছি; সেই চিন্তা কোন সময়ে একটু দানা বাঁধিয়াছে, কোন সময়ে বা বাঁধে নাই। যাহা বাঁধিয়াছে তাহার যদি উপযোগিতা থাকে যাহা বাঁধে নাই তাহারও তেমনি উপযোগিতা থাকিতে পারে,— ইহা মনে করিয়া আদি বয়সের ও মধ্য বয়সের রচনাগুলিকে একত্র প্রকাশিত করিলাম। সাহিত্যের মর্ম্ম স্পর্শ করায় যেটুকু পেলবতার প্রয়োজন তাহা জগতে দুর্ল্লভ। কেহ বলেন, সাহিত্য সমালোচনা রসাস্বাদের ব্যাপার; এখানে দার্শনিক বিশ্লেষণ বা যুক্তি-বিচারের অবসর নাই। আবার অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বলেন যে, সাহিত্য আমাদের মনের মধ্যে একটি বিশিষ্ট মনোভাবের সৃষ্টি করে; তাহার সহিত অনেক সময় রস যুক্ত থাকিলেও সাহিত্যের চরম উদ্দেশ্য রস নহে, তাহার চরম উদ্দেশ্য একটি সৌষমিক মনোভাব বা Aesthetic Attitude। এই প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়া আমার চিত্ত নানা ভাবে দোল খাইয়াছে। আমার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে শেষ বক্তব্য আর একখানি

বৃহৎ গ্রন্থে শীঘ্রই বলিতে চেষ্টা করিব। এই গ্রন্থখানি লেখা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধগুলিতে যদি সাহিত্য সমালোচনা সম্বন্ধে লোকের মনে কিয়দ্দিনের জন্যও একটু জিজ্ঞাসা উদ্রিক্ত হয় তাহা হইলে শ্রম সফল মনে করিব। আমার ছাত্রী পরম কল্যাণাস্পদা শ্রীমতী সুরমা মিত্র এম্, এ যদি তাঁহার নানা কার্য্যের অবসরে ইহার প্রুফ্ দেখিয়া না দিতেন তবে আমার পক্ষে গ্রন্থখানি ছাপান সম্ভব হইত না। নানা কার্য্যে তাঁহার নিকট এত সাহায্য পাই, যে সে ঋণের ভার ধন্যবাদের দ্বারা শোধ হইবার নহে। তাই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া ঋণ শোধের আগ্রহ দেখাইব না।

গ্রন্থকার

উৎসর্গ পত্র

প্রাণর্ষি শ্রীনীলরতন সরকার

হে প্রাণর্ষি, কত রোগ, কত শোক, আর্ত্তের ক্রন্দন
মথেছে তোমার চিত্ত,—জাগায়েছে ব্যথার বন্ধন
বঙ্গের প্রাঙ্গণ-তলে সকলের সাথে সুনিবিড়।
তোমার পরশ পেয়ে রোগী রচে আরোগ্যের নীড়,—
নিরাশ্রয় বিপন্নের মৃত্যুভয় নিমেষেতে টুটে,
আশার গুঞ্জন-ধ্বনি কণ্ঠতলে ঝঙ্কারিয়া ফুটে।
পাণি-পদ্ম হ'তে তব দেবতার আশীর্ব্বাদ ঝরে,—
প্রভাতের আলো যেন ভুবনের পাত্র দেয় ভরে;
বেত্রাহত মৃত্যুদূত আগমনে সভয়ে পলায়
অরুণের রশ্মিঘাতে দিবাভীত উলূকের প্রায়।
আদি বৈদ্য নীলকণ্ঠ সম কণ্ঠে ধরি আতুরের
রোগ গ্লানি শঙ্কা ভয় সর্ব্ববীজ উদ্বেগ তাপের,
নিজে রহ অবিক্ষুব্ধ হিমাদ্রি সমান অচঞ্চল;
আন শুধু স্মিতহাস্যে সকলের ধৈর্য্যের সম্বল।
আর্ত্তরোগী, রোগিবন্ধু,—বর্ষে সদা শত প্রশ্নধার,—
শঙ্কাভরে খুঁজে ফেরে মুখে তব উদ্বেগের ভার;
হে প্রশান্ত,—নাহি দেখে ললাটে কুঞ্চিত রেখা তব,
শুধু হাসিমুখে কও,—'এ লক্ষণ নহে কিছু নব'।

হে প্রবীণ,—কত জ্ঞান তব চিত্তে পেল সঙ্কেতন,—
সুপ্ত-প্রায় কত তত্ত্ব পেয়ে তব প্রাণ-আয়তন
পেল যেন নব জাগরণ বুদ্ধির স্পন্দনে তব,—
জরা-জীর্ণ মৃত শাস্ত্র তোমা মাঝে প্রাণ পায় নব ;
সূর্য্যকর তরঙ্গেতে মৃত প্রায় ওষধি সমান,
সঞ্জীবনবিদ্যাবপু, ধ্যানময় তুমি জ্যোতিষ্মান্ ।
কর্দ্দমে ফুটিয়া ফুল আপনার কর্দ্দম শরীর
নিরন্তর গুপ্ত রাখি, সৌন্দর্য্যেরে করিছে বাহির ;—
তুমিও তেমন যেন আপনারে দিলে ডুবাইয়া,—
কণ্টকবেষ্টিত বৃন্তে জলে পঙ্ক দিলে ভাসাইয়া,—
রাখিলে ভাসায়ে সদা নিরঞ্জন তব পদ্ম-মুখ
প্রসন্ন মৈত্রীতে ভরা দয়ায় কারুণ্যে ভরা বুক ।
এ মুগ্ধ দেশের লাগি কত ক্ষতি তুমি অকাতরে
সহিয়াছ যৌবনের প্রান্ত হ'তে সদা শ্রদ্ধাভরে ;
সহিয়াছ কত গ্লানি, কত অনটন হাসিমুখে !
আপনারে কোন দিন করো নি প্রচার ; দুঃখে সুখে
আপন গভীর খাতে বহিয়া এনেছ আশীর্ব্বাদ,
পূত ভাগীরথী সম দেবতার মহান্ প্রসাদ !
কত ধন লুটিয়াছে পায়ে তব—পূজা অর্ঘ্যভারে,—
রাখ নাই কণা মাত্র,—বিলায়ে দিয়েছ স্নেহধারে ;
পুত্র-কন্যা-জামাতৃ-বন্ধনে পূর্ণ তুমি হে বিত্তাশী,—
অন্তরে নিঃসঙ্গ ভিক্ষু তুমি দেব আবাল্য সন্ন্যাসী !

কূর্ম্ম যথা অস্থি মাঝে আপনারে রাখে সঙ্গোপনে,
শোভাদন্তে করী যথা সকলেরে ভুলায় নয়নে,
তেমনি হে যোগি,—তুমি আপনারে দৃষ্টির বাহিরে
নিরন্তর রাখিয়াছ দূরে ; তবুও তোমায় ঘিরে
ঝরে অজস্রধারে পূজ্যপূজা, ত্যাগ, সেবা, দান,—
কঠোর সংযম ভেদি' শান্ত স্নিগ্ধ কর্ম্ম-দীপ্ত জ্ঞান,
মূর্ত্ত মানবের প্রেমে প্রতিদিন মানব কল্যাণে।
দেবতার প্রেমধারা তোমা মাঝে পরম নির্ব্বাণে
নামিয়াছে নিরন্তর ; জ্বলিয়াছে পূত চিত্ত তব
ধূপশিখা সম আপনারে দহি সদা, নব নব
গন্ধভারে ; হে প্রেমিক, যে প্রেমের দিলে পরিচয়
সেইখানে নিত্য-পূজা লভে দেব বিশ্বের আশ্রয়।
নিত্য তুমি প্রেমলোকে আপনারে কর আবিষ্কার,
ক্ষুদ্র গ্রন্থ অর্ঘ্য দিয়ে চরণে রাখিনু নমস্কার।

সাহিত্য-পরিচয়

কোনও শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দ্বারা সেই শব্দের ভাষায় প্রচলিত তাৎপর্য্যের নির্ণয় করা যায় এ কথা বলা চলে না। গম্ ধাতু হইতে গো শব্দের উৎপত্তি, তাই বলিয়া যাহা চলে তাহাই গো এই ব্যুৎপত্তির অনুসন্ধান করিয়া গোরু অর্থে ব্যবহৃত গো শব্দের তাৎপর্য্য বাহির করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যাহা চলে বা গমন করে তাহাকেই গোরু বলা চলে না এবং ব্যুৎপত্তির অনুরোধে অর্থ করিতে গেলে গৌস্তিষ্ঠতি বা গোরু বসিয়া আছে এরূপ বলা চলে না। কারণ, সচল বস্তুকেই যদি গৌঃ বলিতে হয় তবে বসিয়া থাকিলে তাহার সে নাম সম্ভব হয় না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ব্যুৎপত্তিগত অর্থের অনুসন্ধান করিলে তাৎপর্য্যের যে বীজটি পাওয়া যায়, কালক্রমে চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদানের সাহায্যে সামাজিক ও ব্যবহারিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্রমপরিণতির ধারাটি লক্ষ্য করিয়া চলিলে, তাহার ভাষায় প্রচলিত তাৎপর্য্যটির সার্থকতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ভাষায় একটি শব্দের নানা অর্থে ব্যবহার দেখা যায়, তাহাদের সঙ্গতি করিতে হইলে অনেক সময়েই ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সাহায্য লইতে হয়। মানুষের চিত্তে ক্রমপরিবর্ত্তমান ভাব-ধারা হইতে রস সংগ্রহ করিয়া একটি আদিম

অর্থ আপনাকে নানা শাখা-প্রশাখায় ব্যক্ত করিয়া বিভিন্ন অর্থরূপে প্রকাশ করে। আবার অনেক সময়ে ইহাও দেখা যায় যে ভাবধারার পরিবর্ত্তনে মূল অর্থটি ভাষা হইতে বিলুপ্ত ও বিস্মৃত হইয়া যায় এবং শব্দকে আশ্রয় করিয়া একেবারে নূতন অর্থের উৎপত্তি হয়, অথচ তাহার সহিত সম্পর্ক একেবারে বিলুপ্ত হয় না। এই অর্থ-পরম্পরার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে মানুষের চিত্ত কোনও একটি বীজ-ভাবকে (Concept) অবলম্বন করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না। সে তাহার মধ্যে নূতন নূতন অর্থ, নূতন নূতন তাৎপর্য্য অনুসন্ধান ও সৃষ্টি করিয়া আপনাকে সম্মুখের পথে চালিত করিতে থাকে এবং এইজন্য একটি শব্দের বৃন্তে নানা দেশে নানা কালে বিভিন্ন অর্থ বিভিন্ন তাৎপর্য্য ফুটিয়া উঠে। সেইজন্য কোনও একটি বিশিষ্ট শব্দের যে কি তাৎপর্য্য তাহার কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট উত্তর দেওয়া যায় না। অর্থ ও তাৎপর্য্যের জিজ্ঞাসা হইলেই প্রশ্ন উঠে এ অর্থ কোন্ কালের? কোন্ দেশের? কোন্ সমাজের? কোন্ ভাবুকের চিত্তবৃত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল? ক্রমপরিবর্ত্তমান অর্থ-সঞ্চয়ের মধ্য দিয়া কিসের অনুসন্ধান চলিয়াছে তাহার অনুসন্ধান না করিলে সেই শব্দের তাৎপর্য্য-নির্ণয় দুঃসাধ্য হয়। এইজন্য গায়ের জোরে বা গলার জোরে মত স্থাপনের যে রীতি দেখা যায় তাহাতে দ্বন্দ্ব বাড়িয়া উঠে, কিন্তু মীমাংসা হয় না।

সাহিত্য শব্দটি সংস্কৃত হইতে বাংলায় আসিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে অন্য কিছু আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দের কি অর্থ ও তাৎপর্য্য চলিয়া আসিয়াছে তাহাই প্রধানতঃ এই প্রবন্ধে আলোচনা

করিব। 'সহ' বা 'সহিত' শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই সাহিত্য শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কারণ, অতি প্রাচীন গ্রন্থে এই শব্দটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার মূল অর্থ "একসঙ্গে বা একত্র থাকা।" দুটি জিনিষ একত্র আছে এই তাৎপর্য্য বুঝাইতে এ কথা বলা চলে যে তাহাদের সাহিত্য আছে। আবার কোনও লোকের সহিত সঙ্গ করাকে তাহার সাহিত্য করা বলা চলে। কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্রে স্ত্রীসঙ্গ করিতে নিষেধ করিতে গিয়া লেখা হইয়াছে—"একার্থচর্য্যাং সাহিত্যং সংসর্গঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।" আমরা বাংলায় সাহিত্য শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করি সেই অর্থে অতি প্রাচীন কালে কাব্য শব্দই ব্যবহৃত হইত। মধ্য-যুগ হইতে 'সাহিত্য' এই শব্দের প্রচলন দেখা যায়। কবি-সার্ব্বভৌম রবীন্দ্রনাথ 'সহিত' শব্দ হইতে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিয়া সাহিত্য শব্দের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে গিয়া "বাংলা জাতীয় সাহিত্য" এই প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "সহিত" শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে ভাবে, ভাষায় ভাষায়, গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন তাহা নহে, মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগ-সাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীববন্ধনে সংযুক্ত নহে—তাহারা বিচ্ছিন্ন। পূর্ব্বপুরুষদের সহিতও তাহাদের জীবন্ত যোগ নাই। কেবল পূর্ব্বাপর-প্রচলিত জড় প্রথাবন্ধনের দ্বারা যে যোগ-সাধন হয় তাহা যোগ নহে,

তাহা বন্ধন মাত্র। সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ব্যতীত পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত সচেতন মানসিক যোগ কখনই রক্ষিত হইতে পারে না।"

অর্থটির মধ্যে একটি সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সুসঙ্গতি আছে। কিন্তু এই অর্থে সাহিত্য শব্দ সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয় নাই।

অতিপ্রাচীনকাল হইতে শব্দের সহিত অর্থের যে একটি গভীর সম্পর্ক আছে, এই সত্যটি ভারতবর্ষীয় মনীষীদিগের মনকে নাড়া দিয়াছিল। //কালিদাস বুঝিয়াছিলেন যে বাক্য ও অর্থের তাৎপর্য্য হৃদয়ে প্রতিভাত না হইলে কাব্য লেখা চলে না। তাই তিনি রঘুবংশ কাব্যের প্রথমে হরপার্ব্বতীকে নমস্কার করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে বাক্য ও অর্থের তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য তিনি হরপার্ব্বতীকে নমস্কার করেন। কারণ, বাক্য ও অর্থের সম্বন্ধ যেরূপ নিত্য, অর্দ্ধনারীশ্বর হর-পার্ব্বতীর সম্বন্ধও সেইরূপ নিত্য।//কালিদাসের সমকালীন ভর্ত্তৃহরি তাঁহার বাক্যপদীয়ে লিখিয়াছেন যে ব্রহ্ম যেমন নিজে কূটস্থ থাকিয়াও আপনাকে জগৎরূপে প্রকাশ করেন, শব্দও সেইরূপ ব্রহ্মের ন্যায় কূটস্থ থাকিয়া নানা অর্থের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করেন,—

// 'অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।'//

জ্ঞান যেমন নানা জ্ঞেয় বস্তুর মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করে, শব্দও সেইরূপ আপনাকে নানা অর্থের মধ্য দিয়া প্রকাশ করে,—

//'আত্মরূপং যথাজ্ঞানে জ্ঞেয়রূপঞ্চ দৃশ্যতে
অর্থরূপং তথা শব্দে স্বরূপঞ্চ প্রকাশতে।'//

এই সমস্ত দার্শনিক মতবাদের প্রভাবে শব্দ ও অর্থের মনোহারী সংযোগ-বিশেষকে সাহিত্য বলিয়া বলা হইত। বক্রোক্তিজীবিতকার রাজানক কুন্তক সাহিত্যের লক্ষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্র-কবি-ব্যাপারশালিনি।
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্‌বিদাহ্লাদকারিণি ॥"

কবিকৌশল-কল্পিত রচনাবৈচিত্র্যে চমৎকারকারী শব্দ ও অর্থের সুমধুর বিন্যাসকে সাহিত্য বা কাব্য বলা হয়, কেবল শব্দকে কাব্য বলা যায় না কিংবা কেবল অর্থকে কাব্য বলা যায় না। সেইজন্য যেখানে শুধু শব্দঝঙ্কার আছে সেখানে কাব্য হয় নাই,—

"ত্রিপুরা ত্রিগুণা ত্রিলোচনী ত্রিশূলিনী।
তাপিত তনয়ে তব তারহ তারিণী ॥
থকারে পাথর তুমি থকারের মেয়ে
থির কর থরথর কাঁপি ভয় পেয়ে ॥
দাক্ষায়ণী দয়াময়ী দানব-দমনী।
দুঃখ দূর কর দুর্গা দুর্গতিদলনী ॥"

শুধু অর্থের গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্ব থাকিলেও সাহিত্য বা কাব্য হয় না।

"তুমি মূল প্রকৃতির সকলবিশ্বমূল।
সেই ধন্য তুমি যারে হও অনুকূল ॥
তুমি সকলের সার অসার সকল।
যেখানে তোমার দয়া সেখানে মঙ্গল ॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তোমার ভজনে।
সেই ধন্য তুমি দয়া কর যেই জনে॥
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে প্রবেশিয়া তুমি।
সৃষ্টি কৈলা সুরলোক রসাতল ভূমি॥”

আবার অর্থগাম্ভীর্য্য ও শব্দঝঙ্কার একত্র হইলেও সাহিত্য হয় না। যেমন,—

“আমার মন কালী কালী বল বদনে।
হৌক মরণ যেখানে সেখানে॥
বাল্য যুবা বৃদ্ধকাল কাটাইলে তিনকাল
পরকাল কিসে রয় বল না॥
আগত স্বগত কাল সম্মুখে দেখহ কাল।
কালামুখ হবে কাল কান্তা বিহনে॥”

কোনও দার্শনিক তত্ত্ব যদি কবিতায় প্রকাশ করা যায়, তবে সেই তত্ত্ববাক্যের মধ্যে অর্থের গাম্ভীর্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কাব্য হয় না। এইজন্য সাংখ্যকারিকা কবিতায় লেখা হইলেও তাহা কাব্য নয়। একই অর্থ কোনও রচনা-বিন্যাসে কাব্য হয়, কোনও রচনা-বিন্যাসে সাধারণ কথা মাত্র।//অনেক সময়ে প্রায় একই রকম বিষয়বস্তু কবির বিন্যাসভঙ্গীতে কোনও স্থলে অতি সাধারণ ছন্দোবদ্ধ পদ্য বলিয়া প্রতীত হয়, কোনওস্থলে বা হৃদয়কে চমৎকারিত্বে রস-প্রফুল্ল করিয়া তোলে। চাঁদ উঠিলে বিরহিণীরা পতিবিরহে আর্ত্ত

হইয়া উঠেন সেইজন্য চাঁদ সহসা তাহাদের দৃষ্টির সম্মুখে পড়িতে চায় না। এই কথাটি লিখিতে গিয়া কোনও কবি লিখিয়াছেন,—

"মানিনীজনবিলোচন-পাতা—
নুষ্ণ-বাষ্পকলুষানভিগৃহ্নন্
মন্দমন্দমুদিতঃ প্রযযৌ খং
ভীত ভীত ইব শীত-ময়ূখঃ।"

উষ্ণবাষ্পপ্রচুর মানিনীদের দৃষ্টিলাভের ভয়ে চন্দ্র ধীরে ধীরে উদিত হইয়া আকাশমার্গে গমন করিলেন,—

"ক্রমাদেকদ্বিত্রিপ্রভৃতিপরিপাটীঃ প্রকটয়ন্
কলাঃ স্বৈরং স্বৈরং নবকমলকন্দাঙ্কুররুচঃ।
পুরন্ধ্রীণাং প্রেয়োবিরহদহনোদ্দীপিতদৃশাং
কটাক্ষেভ্যোবিভ্যন্নিভৃত ইব চন্দ্রোঽভ্যুদয়তে॥"

পদ্মের কোরকের ন্যায় সুকোমল কলাগুলি ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া প্রকাশ করিয়া প্রিয়বিরহিণী পুরনারীদিগের রোষকষায়িত কটাক্ষের ভয়ে চন্দ্র যেন অতি সঙ্গোপনে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। এই দ্বিতীয় কবিতাটীর উৎকর্ষ সহজেই বুঝা যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে//কেবল রমণীয় শব্দপ্রয়োগে বা কেবল অর্থের গুরুত্বে কাব্য হয় না। কিন্তু শব্দার্থের একটি বিশেষ চারু সম্মেলনে বা সাহিত্যেই সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।// শব্দার্থের দার্শনিক সম্বন্ধবিষয়ে উল্লেখ করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে শব্দের সহিত অর্থের নিত্য সাহিত্য বা সম্বন্ধ

বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই হিসাবে শব্দ ও অর্থ সর্ব্বদাই সম্মিলিত রহিয়াছে। সাহিত্য বলিতে আমরা সেই বিশেষ সম্মেলনকেই বুঝি, যাহা হৃদয়কে আহ্লাদে ও চমৎকারিত্বে পূর্ণ করিয়া তোলে। এই চমৎকারিত্বের মূলে একদিকে যেমন অর্থের চারুতা অপরদিকে তেমনি বাক্যবিন্যাস ও ছন্দই প্রধান। //

//একই জিনিষ বুঝাইতে হয়তো অনেকগুলি শব্দ থাকিতে পারে কিন্তু তাহাদের সবগুলি কাব্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না। //আবার একজাতীয় দশটি ফুল থাকিতে পারে, দশটি ফল থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের সকলকে কাব্যে ব্যবহার করা যায় না। 'মুকুল' বলা চলে কিন্তু আমের ফুল বলা চলে না। 'আম্র' শব্দের কাব্যে বহু ব্যবহার আছে, কাঁঠাল শব্দের কাব্যে ব্যবহার চলে না। অথচ দুইটিই ভক্ষ্য বটে। রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন যে ভক্ষ্য বলিয়াই ও প্রয়োজন সিদ্ধি করে বলিয়াই ঝিঙা বেগুনের ফুল লইয়া কাব্য চলে না কিন্তু মল্লিকা বা টগর না হইলে কাব্য অচল, তাহার প্রধান কারণ এই যে তাহারা কোনও ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগে না, সে কথা নিঃসন্দিগ্ধ বলিয়া মানা চলে না। //শব্দের মধ্যেই এমন একটি বিশেষত্ব আছে যে সেই শব্দ সাহিত্যে ব্যবহারের উপযোগী, কিন্তু তজ্জাতীয় অন্য শব্দ নহে। শব্দের একটি বিশেষ ধর্ম্ম বা সম্পদ্ আছে যাহা অনুসরণ করিয়া কবি তাঁহার প্রতিভার বলে তাহাকে চয়ন করিয়া সাহিত্যের মালা সৃষ্টি করেন।// সেই ধর্ম্ম বা সম্পদ্ কেমন করিয়া উৎপন্ন হয় সে আলোচনা এখানে করিব না। কিন্তু এপর্য্যন্ত বলা যায় যে তাহার

মর্ম্ম অতি নিগূঢ় এবং ব্যাপক এবং সেইজন্য প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনের হেতু নির্দ্দেশ করিয়া সেখানে ক্ষান্ত হওয়া যায় না।”

সংসারে বিষয়বস্তুর অভাব নাই এবং আলোচনা ও বর্ণনার ক্ষেত্র প্রায় অসীম ও অনন্ত। তথাপি সমস্ত প্রকারের আলোচনা সাহিত্যে স্থান পায় না এবং সহৃদয় বোদ্ধার হৃদয় আনন্দস্পন্দে মুখর করিয়া তুলিতে পারে না। আজকাল প্রায়ই দুইদলের মধ্যে তুমুল আন্দোলন দেখা যায়। একদল বলেন সাহিত্যে প্রধানতঃ সেই জিনিষেরই স্থান হওয়া উচিত, যাহা দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে কিন্তু আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে যত বড় কবিই হোক না কেন তিনি ‘কুইনাইনের’ স্তোত্র লিখিয়া যশস্বী হইতে পারেন না। কেহ কেহ আবার বলেন যে যাহা কিছু আছে তাহারই উপর কাব্য লেখা চলে। শুনিয়াছি কোনও কবি ঝিঙা পটল আলু সব্জীর উপর কবিতা লিখিতে সুরু করিয়াছেন। আবার একদল তরুণ কবি মানুষের মধ্যে যাহা কিছু মালিন্য যাহা কিছু গ্লানি আছে, তাহাই কাব্যে প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন। মনের মলিনতা মানুষ দূর করিতে না পারিলেও তাহাকে তাহা চাপিয়া রাখিতে হয়। সেই মলিনতার আস্বাদের মধ্যে একটা মত্ততা আছে, সেইজন্য কাব্যে সেই মলিনতার প্রতিচ্ছবি দেখিলেও সে তাহার একটা আস্বাদ পাইয়া নাচিয়া উঠে কিন্তু একথা নিশ্চিত বলা যায় যে এই জাতীয় সাহিত্য কোনও মানুষের অন্তরকে চমৎকারিত্বে ও আহ্লাদরসে সিক্ত করিয়া তুলিতে পারে না।

//যে কোনও বিষয় অবলম্বন করিয়া এবং যে কোনওরূপ শব্দ-বিন্যাস করিয়াই সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় একথা গলার জোরে প্রচার করিবার চেষ্টা করা যায় কিন্তু নিঃশব্দে চিরন্তন কালের সাহিত্য ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় এবং ক্ষমাহীন কাল আপন কুটিল কটাক্ষে এই মদন-সাহিত্যকে ভস্ম করিয়া দেয়।// বিশিষ্ট শব্দ-বিন্যাসের ও বিশিষ্ট অর্থের সুচারুভঙ্গীতে জীব তাহার প্রতিভার বলে যে অক্ষয় সাহিত্য সৃষ্টি করেন Moralist, Realist বা Idealist তাহার আবর্ত্তিত ঘূর্ণিতে ধীরে ধীরে তলাইয়া যান। যে কোনও ঘটনা ঘটে তাহারই স্বাভাবিক বর্ণনা যদি সাহিত্য হইত তাহা হইলে পুলিশ কোর্টের মোকদ্দমার বিবরণে সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যাইত। অথচ সেই সমস্ত মোকদ্দমার ঘটনার কোন বিশেষ অংশকে অবলম্বন করিয়া যদি কোনও প্রতিভাবান্ কবি যথোপযুক্ত শব্দবিন্যাস ও রচনা-বৈচিত্র্যে চমৎকারিত্ব প্রকাশ করিতে পারেন তাহা হইলে সে সাহিত্য হয়ত যুগান্ত কাল পর্য্যন্ত লোকের চিত্ত হরণ করিবে। //সাহিত্যে কুৎসিতের কোন স্থান নাই পঙ্কের কোনও স্থান নাই, একথা আমি বলি না কিন্তু তাহাদের স্থান দিতে হইলে চমৎকারিত্বের সুষমাময় পঙ্কজে তাহা-দিগকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সমাজের ক্রম-পরিবর্ত্তনে ও ক্রম-পরিণতিতে ভাষা, রুচি, রাষ্ট্র, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিত্তভূমির পরিবর্ত্তন হয় একথা সত্য এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে চমৎকারিত্বের নূতন নূতন পদ্ধতি ও পর্য্যায়েরও সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন কালের স্বাভাবিক গতিতে

নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যতই সাহসিক হউক না কেন কোনও তরুণ কবির দল গায়ের জোরে বা গলার জোরে সাহিত্যের নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে পারেন না। কোনও শব্দ যদি অপাংক্তেয় বা অশুচি হইয়া থাকে তাহাকে সাহিত্যের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিবার অধিকার রাজার নিয়মশাসনেরও আয়ত্ত নহে। জোর করিয়া তাহা করিতে গেলে সে মন্দিরে সাহিত্যের চিরন্তন পূজারী প্রবেশ করিবেন না। সেইজন্য কুন্তক বলিয়াছেন,

"সাহিত্যমনয়োঃ শোভাশালিতাং প্রতি কাপ্যসৌ
অন্যূনানতিরিক্তত্বমনোহারিণ্যবস্থিতিঃ ॥"

শব্দ ও অর্থের যে অনির্ব্বচনীয় শোভার সম্মেলন হয় তাহাকে সাহিত্য বলে। শব্দার্থের এই বিচিত্র বন্ধ বা বিন্যাস তখনই সম্ভব হয় যখন কবি তাঁহার প্রতিভাবলে যেখানে যে ভাবটি বা শব্দটি উপযুক্ত হয় তাহাই আহরণ করিয়া সমস্ত বাহুল্য ও ন্যূনতা বর্জ্জন করিয়া তাঁহার রচনাকে মনোহারিণী করিয়া তোলেন। সেই শব্দার্থের সম্মেলনকেই সাহিত্য বলে যখন তাহাদের বিন্যাসের ফলে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় এবং সেই সৌন্দর্য্য চিত্তের মধ্যে একটি চমৎকারিত্ব উদ্ভিন্ন করিয়া তাহাকে আনন্দে বিভোর করিয়া দেয়। এই আনন্দ বিষয়-বস্তু সম্ভোগের আনন্দ নয় বা শব্দঝঙ্কারের আনন্দ নয় বা অর্থমাহাত্ম্যের গভীর অনুভব নয় কিন্তু এই সমস্ত একত্র হইয়া তাহাদের সাহিত্যের সম্মিলিত ফলে যে চমৎকারিত্ব ও আহ্লাদের কিরণরাজি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহা একটি বিশিষ্ট পর্য্যায়ের সম্ভোগ। গ্রাম্য লোকের

ভোগস্পৃহার হর্ষে শব্দঝঙ্কারের কর্ণপরিতৃপ্ততায় তাহার প্রমাণ নহে, তাহার প্রমাণ সহৃদয় সমজদারের হৃদয়ের দ্রবীভাবে। অতএব কেন ভাল লাগিল এবং কেন ভাল লাগিল না অর্থাৎ সহৃদয় সমজদারের ভাল লাগিল কি না এবং সেই ভাললাগাটি শব্দার্থের বিচিত্র ও রমণীয় সন্নিবেশ প্রযুক্ত কি না তাহাই বিচার করিতে হইবে।

/ অর্থ শব্দটির নানা অর্থে ব্যবহার আছে, অর্থ বলিতে বাচ্যার্থ বুঝায়, লক্ষ্যার্থ বুঝায় ও ব্যঙ্গার্থ বুঝায়। নানা অর্থের সন্নিবেশ ও মিলনে যে তাৎপর্য্যটি প্রকাশ পায় হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে স্মরণ ও সংস্কারের বীণাযন্ত্রে যে লহরের পর লহর খেলিয়া যায় তাহা কোনও বাচ্যার্থের একান্ত বহির্ভূত হইলেও ব্যঙ্গার্থের মধ্যে অন্তর্ভূত।/ সাধারণতঃ শব্দার্থ বলিলে শুধু সেই অর্থটিকেই বুঝায় যাহা সকলেরই নিকট সুবিদিত, কিন্তু সেই সুবিদিত শব্দার্থ-পরম্পরাকে কবি এমন সুন্দর করিয়া এমন বিচিত্রভাবে সাজাইয়া তোলেন যে তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের অমূর্ত্ত গভীর অনুভূতি অতুলনীয় বর্ণচ্ছটায় ও রূপে সম্পদে মূর্ত্ত হইয়া উঠে।// যখন কবি বলেন,

"অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই আমি এমন তরণী বাওয়া।"

আর যখন ইহাই রূপান্তরে বলা যায়, সাদা পালে বাতাস লাগিয়াছে এরকম নৌকা বাওয়া দেখি নাই এই দুইটি বাক্যের বাচ্যার্থ একরূপ হইলেও কবির বাক্যটি পড়িলেই হৃদয় যেন আনন্দে দোলা দিয়া উঠে। যেন মনে হয় হৃদয়ের মধ্যে কোথায় কোন শীতল স্পর্শে আমাদের জীবন-

তরীটি বহিয়া চলিয়াছে—তাহার প্রতিস্পন্দনটি যেন ছন্দের তালে তালে বুকের মধ্যে নাচিয়া উঠে, অদৃশ্য কাণ্ডারীর মোহন স্পর্শ যেন জীবনের গতির মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠে। //অনেক স্থলে এমন ঘটে যেখানে কোনও গভীর অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না অথচ যেন একটি অস্পষ্ট বেদনা, একটি অনুভূতির ছায়া, মৃদু স্পন্দনে চিত্তকে একটি অনির্ব্বচনীয় স্পর্শে বিহ্বল করিয়া দেয়।//

"গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা ব'সে আছি নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হল সারা
ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।"

অথবা যেমন Swinburneএর

Their glowing ghosts of flowers
Draw down draw high ;
And wings of swift-spent hours
Take flight and fly
She sees by formless glimpse
She bears across cold streams
Dead mouths of many dreams that sing
and sigh.

কবিতাটীর কোনও সুস্পষ্ট অর্থ নাই, অথচ শব্দের বিম্ব প্রতিবিম্বের দ্বারা যেন একটা অস্পষ্ট ছায়া চিত্তে ভাসিয়া ওঠে।

// অর্থের মধ্যে বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ ছাড়া আর একটি দ্যোতনাত্মক বা ব্যঙ্গাত্মক অর্থ আছে যাহাকে ইংরেজীতে Suggestion বলে। অধিকাংশ সমালোচকই ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং এই দ্যোতনাত্মক ব্যাপারের ফলে একদিকে যেমন মন আনন্দরসে বিহ্বল হইয়া ওঠে অপরদিকে তেমনই একটি কোনও বিশেষ তাৎপর্য্য কোনও গভীর সত্য বা কোনও গভীর অনুভব জাগিয়া ওঠে। এই দ্যোতনার মধ্যে যে রসটি স্ফূর্ত্তি পায় অনেকেই তাহাকে কাব্যের প্রাণ বলিয়াছেন। কিন্তু এই রসের পিছনে চিত্তভূমিকে ব্যাপ্ত করিয়া সিক্ত ভূখণ্ডের ন্যায় যে একটি ভাবভূমি বা attitude আত্মপ্রকাশ করে সাহিত্য-সৃষ্টিতে তাহার স্থান বড় কম নহে। এই ভাবভূমিই যেন স্থানে স্থানে আপনাকে বিদ্রুত করিয়া রসপ্লাবনে পরিণত হইয়া ওঠে। অনেক সময়ে এমন ঘটে যে কোনও রস বা বস্তু সুস্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া ওঠে নাই, চিত্তের কতটা স্থান যেন কবিতার দ্বারায় স্নিগ্ধ সুন্দর হইয়া ওঠে, সেই বেদনকে রস বলা যায় কি না জানি না, বেদনা বলা যায় কিনা জানি না তাহা অস্পষ্ট অথচ অনুভূতিতে সান্দ্রগহন।//

তরুলতা-গুল্মশস্পরাজি নদী-সমুদ্র-ভূধরের রূপচ্ছবিতে মন্দপবনের মৃদুস্পর্শে পুষ্পগন্ধে কিংবা আপন মনের আনন্দের আলোড়নে কবির জ্ঞানধর্ম্মী চিত্তবৃত্তি তলাইয়া যায়। তখন প্রমুষ্টতত্তাক-স্মৃতির একটি অস্পষ্ট প্রতিভাস স্ফুরিত হইয়া ওঠে; সংস্কারের নিবিড় অন্তঃপুর

পর্য্যন্ত যেন একটি স্পন্দন বিকম্পিত হইয়া ওঠে এবং আপ্লুত করিয়া তোলে তাহারই ফলে কবির চিত্তে একটি বিচিত্র ও বিশিষ্ট ভাবভূমি প্রতিফলিত হয় এবং কবি-পুরুষের সমগ্র সত্তাকে কবিপ্রতিভার বলে এই ভাবভূমি শব্দার্থের বিন্যাসে সাহিত্যের রূপ-কলার সৃষ্টি করে। প্রমুষ্ট শব্দের অর্থ অপহৃত বা লুপ্ত। তত্তা শব্দের অর্থ সেই সেই বস্তু। **প্রমুষ্টতত্তাক স্মৃতি** বলিতে সেই স্মৃতিকে বুঝায় যেখানে স্মরণ আছে অথচ কি স্মরণ হইল তাহার বোধ নাই। কবি যখন তাঁহার বাতায়নপথে উদার বিরাট মাঠের দিকে তাকাইয়া থাকেন, তখন যদি আরও যে মাঠ তিনি পূর্ব্বে দেখিয়াছেন তাহা তাঁহার মনে পড়ে তখন তাহাকে স্মরণ বলা যায় কিন্তু যখন কোনও পরিচিত মাঠের কথা মনে পড়ে না অথচ পূর্ব্বানুভূত একটি অব্যক্ত প্রশস্ততা মনের মধ্যে ভাসিয়া ওঠে তখন তাহাকে বলা যায় প্রমুষ্ট-তত্তাকস্মৃতি। এই প্রমুষ্ট-তত্তাক-স্মৃতির পিছনে থাকে **সংস্কার**। সংস্কার চিত্তের উপরে ভাসিয়া ওঠে না সে থাকে এক পরদা নীচে। এই সংস্কারের মধ্যে ওই রকম মাঠ দেখিয়া নানা বিচিত্র অবস্থায় নানা বিচিত্র ব্যবস্থায় সুহৃৎসঙ্গে জ্যোৎস্নালোকে নদীতীরে নানাভাবে পূর্ব্বে যা কিছু আনন্দ অনুভূত হইয়াছিল তাহা সঞ্চিত হইয়া একত্র পিণ্ডীভূত হইয়া স্মৃতির ভূমিকে অব্যক্তভাবে রসপূরিত করিয়া তুলে। এই প্রমুষ্টতত্তাক স্মৃতি ও সংস্কারের যৌথ নাম **বাসনা**। //অর্থ বলিতে শুধু বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্গ বুঝায় না। তাহাতে একদিকে বুঝায় তাৎপর্য্য অপরদিকে বুঝায় দ্যোতিত বা ইঙ্গিত-বোধ্য বস্তু এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রমুষ্ট-

তত্তাক স্মৃতি ও সংস্কারের সহযোগে যে বাসনাক্ষেত্রটি সিক্ত হইয়া ওঠে ও তাহার আত্মপ্রকাশে যে রসবিন্দু ক্ষরিত হইতে থাকে তাহাকেও বুঝায়। কবির মনের ছবি যখন তাহার ভাবভূমির সম্বন্ধের সাহায্যে নানা শব্দের ও অর্থের বিচিত্র বিন্যাসে ধ্বনিত হইয়া শ্রোতার ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া তাহার বুদ্ধিভূমিকে মথিত করিয়া তাহার অন্তর্নিবিষ্ট ভাবভূমিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার হৃদয়কে দ্যোতনায় ও রসে বিচিত্র ও মনোহর করিয়া তোলে, তখনই তাঁহার সুন্দরের অনুভূতি হয় এবং মনঃপ্রাণ রসে সিক্ত হইয়া ওঠে। এই যে কবির মনোভাব, মনের স্পর্শ, হৃদয়ের অনুভূতি, যাহা তাঁহার একান্ত আপনার, একান্ত ব্যক্তিগত যাহা ভাষার বাচ্যার্থের দ্বারা একান্ত অপ্রকাশ্য অনির্ব্বচনীয়, তাহাকে যে তিনি চিরন্তন কালের সহৃদয়-সংবেদ্য করিয়া তুলিতে পারেন, এই যে ব্যক্তি-গতকে সহৃদয় সাধারণের গোচরীভূত করার ব্যাপার ইহাকেই বলে **সাধারণীকৃতি** বা universalisation of art. যে বিশিষ্ট শব্দ ও অর্থের বিন্যাসের কৌশলে এইটি সম্পন্ন করা যায় তাহার মূলীভূত কারণকে বলা যায় প্রতিভা। //

বিশ্বনাথ রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলিয়াছেন। আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনব গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রসই কাব্যের প্রাণ এই মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইংরেজীতে রসকে অনেক সময়ে emotion বলা হয়। রস কাহাকে বলে তাহার বিশেষ পর্য্যালোচনা এ প্রবন্ধে করিব না। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যাইবে যে আনন্দ বা সুখ মাত্রই রস নহে কিংবা ভয় প্রভৃতি যে কোন Emotionই রস নয়। কেহ পুত্রশোকে কাঁদি-

তেছে দেখিয়া যদি কেহ বলে যে তাহার করুণ রসের উদ্রেক হইয়াছে বা কেহ ভীত হইলে যদি কেহ বলে উহার ভয়াত্মক রসের উদ্রেক হইয়াছে তাহা হইলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

জৈব প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া যে Emotion উত্থিত হয় অর্থাৎ Self-preservation বা Race-preservation প্রভৃতি জৈব ব্যাপারের ইষ্টানিষ্ট সংঘটনের সম্ভাবনায় যে ভাব বা Emotion উত্থিত হয় তাহাকে রস বলা যায় না। যদি একজনকে বলা যায় যে আপনার পুত্র সর্পাঘাতে মরিয়াছে, তাহা হইলে তাহার মনে যে শোক উপস্থিত হয় তাহা শব্দার্থের দ্বারা আপাততঃ উৎপন্ন হইলেও তাহাকে করুণ রস বলা যায় না। ইহার প্রথম কারণ এই যে পুত্রশোকে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহা একান্তভাবে জৈব প্রয়োজনের সহিত জড়িত। দ্বিতীয়তঃ আপনার পুত্র মরিয়াছে এই বাক্যটি বক্তার হৃদয়ের কোনও গভীর অনির্ব্বচনীয় অনুভূতিকে প্রকাশ করে না; মনের Logical faculty বা উহাপোহ বুদ্ধির দ্বারা যেটিকে পাওয়া যায়, যাহা আমরা সকল সময়ে ভাষায় প্রকাশ করি সেই প্রকাশের দ্বারা চিন্তার আদান প্রদান হয়, কিন্তু সাহিত্যের ভাব ব্যক্ত হয় না।

কবি বলিয়াছেন 'পাতা নড়ে, জল পড়ে' এইখান হইতেই সাহিত্যের আরম্ভ, কিন্তু 'বৃষ্টি পড়িতেছে' বা 'এই বৃক্ষের পাতা নড়িতেছে' ইহাতে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে ইহা বলা যায় না। ইহার কারণ,—একটিতে ছন্দ আছে অপরটিতে নাই তাহাই নহে। 'জল পড়ে পাতা নড়ে', এই বাক্যটি শব্দের বিন্যাসে ও ছন্দে প্রাকৃতিক ব্যাপারের একটি অনুভূতিকে

বিধৃত করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। সে অনুভূতিটি জল পড়া ও পাতা নড়া অপেক্ষা অনেক অধিক। শুধু প্রাকৃতিক ব্যাপারের বর্ণনাকে সাহিত্যসৃষ্টি এইজন্যই বলা যায় না যে সেখানে ত কোনও অপ্রকাশ্য গভীর অনুভবকে প্রকাশ করা হয় না। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' এখানে যে অনুভবটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে উহা কোনও মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি ছন্দের সাহায্যে ও শব্দের বিন্যাসে একটি অতি ক্ষুদ্র প্রাকৃতিক ব্যাপারের অনুভব বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু সেটি যদি শুধু পাতা নড়া এবং জল পড়াই হইত, তাহা হইলে এখানে সাহিত্যের সূচনা পাওয়া যাইত না।

/শব্দের বিন্যাসে, রচনার বিন্যাসে, ছন্দের ঝঙ্কারে, ছবিতে, তাৎপর্য্যে, ইঙ্গিতে, সাধারণীকরণে, অনুভূতিতে, রসের উচ্ছ্বাসে যাহা যত প্রচুর সম্ভোগে ভূয়িষ্ঠ হইয়া উঠিবে, তাহাকে সেই পরিমাণেই সাহিত্যের উৎকৃষ্ট সৃষ্টি হইল বলা যায়।/

সাহিত্যের মধ্যে যদি প্রকাশের কোনও বিশেষ কৌশল বা সৃষ্টি-নৈপুণ্য থাকে, তবে তাহা কেবল Logical judgment বা প্রতিজ্ঞা-মাত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না। 'এই ফুলটি লাল' কি 'এই ফুলটি লাল নয়' কি 'সকল মানুষ মরে' 'রাম মানুষ অতএব রাম মরিবে', এখানে Logical judgment দ্বারা একটি অর্থ বা অর্থপরম্পরা প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ সাহিত্য হয় নাই। ভাষাপ্রয়োগের দ্বারা মনের ভাব-প্রকাশের যে কৌশল সেটা Logical art বা উহাপোহের কৌশল,—সাহিত্যের নহে। একটু-না-একটু পরিমাণে যদি দুষ্প্রাপ্য

অন্তরের দরদ বা অনুভূতিকে প্রকাশ না করা যায়, তবে সেটা সাহিত্য হয় না।

অন্তরের ভাবভূমির অনুভূতিকে সাধারণ বাক্যের বিন্যাসে প্রকাশ করা যায় না, সেই প্রকাশে স্বতন্ত্র কৌশলের প্রয়োজন, সেই কৌশলই কাব্যের কৌশল। ক্রৌঞ্চীর বিয়োগে ক্রৌঞ্চের শোক দেখিয়া কবিগুরুর দরদটুকু রামায়ণের শ্লোক হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই দরদের ভাবভূমিটি যদি সুব্যক্ত না হইত, তবে কেবলমাত্র রামায়ণের গল্পটি কাব্য হইত না।

শব্দার্থের বিন্যাসে কোনও ঘটনার বর্ণনা করা যায় এবং সেই ঘটনা শুনিয়া জৈব প্রয়োজনের তৃপ্তি, অতৃপ্তি বা দুঃখের উৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু সেই দুঃখের উৎপত্তির জন্য সেই ঘটনার বর্ণনাটিকে কাব্য বলা যায় না। সেইজন্য যদি কোনও কুৎসিত ভাবের উদয় হইয়া কাহারও মনে ইন্দ্রিয়-সুখের আস্বাদ জাগিয়া উঠে, তাহাকে সাহিত্য বলা যায় না। //কেবলমাত্র শব্দার্থের বিচিত্র বিন্যাসের কৌশলে কোনও non-logical অনুভূতি বা দরদ ফুটিয়া উঠে তখন শব্দার্থ-সম্মেলনের সেই কৌশলকেই সাহিত্য বলে। //

রস না হইলে সাহিত্য হয় না এবং রসই সাহিত্য-সৃষ্টির একমাত্র মাপকাঠি,—এই মতটি লোকসমাজে বহুলভাবে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। রস অর্থে যদি কেবলমাত্র আনন্দ বা আহ্লাদ বুঝায় এবং তাহা ছাড়া যদি সাহিত্যের অন্য কোনও মাপকাঠি না থাকে, তবে রসের বেশী কমের উপরেই বা রসবোধের প্রতীতির স্পষ্টতা বা অস্পষ্টতাই

কাব্যের ভাল-মন্দের পরিচয়। কারণ, রস যদি কেবল Emotion বা ভাব মাত্র হয়, তবে তাহার মধ্যে অন্য কোনরূপ বাহিরের কারণ আসিতে পারে না।

সুখ যদি একান্তভাবে একটি অবিমিশ্র ও মৌলিক বস্তু হয়, তবে একটি সুখের সঙ্গে অন্য সুখের তারতম্য কেবল মাত্র বাহুল্য বা ন্যূনতার উপরেই নির্ভর করে ; কারণ, সুখের মধ্যে কোনও শ্রেণীবিভাগ চলে না। শ্রেণীবিভাগ করিতে গেলেই সেই উচ্চ-নীচ বিভাগের কোনও স্বতন্ত্র কারণ নির্দ্দেশ করিতে হয়। একটি সুখের সহিত অন্য সুখের কেবল মাত্র কম বেশীর বা ক্ষণস্থায়িত্ব দীর্ঘ-স্থায়িত্বের পার্থক্যই মাত্র স্বীকার করা যায়। কিন্তু একটি সুখের সহিত অন্য সুখের কোনও শ্রেণীগত উচ্চ-নীচতার পার্থক্য এতই অনুভবসিদ্ধ যে, দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর সুখের মধ্যে অনেক সময়েই তারতম্য নির্ণয় করা যায় না।

দার্শনিক চিন্তার আনন্দ এবং তাসখেলার আনন্দ এতই বিভিন্ন জাতীয় যে, ইহাদের মধ্যে বেশী কমের তুলনা করা চলে না। ইহা সত্য যে এই দুই জাতীয় আনন্দই আমাদের চিত্তের বিভিন্ন তন্ত্রীতে বিভিন্ন রকমে আঘাত করে এবং যে দিকটি যখন অনুকূল হয়, আমরা সেই দিকেই আমাদের ছাড়িয়া দিই। কিন্তু তথাপি একথা স্বীকার করিতে হয় যে দার্শনিক চিন্তার আনন্দ বা সজ্জন-সঙ্গের আনন্দ তাস খেলা বা নিমন্ত্রণ খাওয়ার আনন্দ অপেক্ষা উঁচুদরের।

ইংরাজী Ethicsএ Hedonism (সুখবাদ) এর আলোচনায় গ্রীক Cyrenaics হইতে আরম্ভ করিয়া Millএর হিতবাদ পর্য্যন্ত

সুখবাদের যে পরিণতি দেখা যায় তাহাতে সুখের অন্বেষণের দ্বারা সুখকেও পাওয়া যায় না। সুখের মধ্যে সুখের শ্রেণীগত বিভাগ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই এবং এই শ্রেণীবিভাগ-নির্ণয়ে যাহাদের উভয়-বিধ সুখেরই জ্ঞান আছে, তাহাদের বাক্যকেই প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। প্রত্যেক ভাললাগার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সুখটি উঁচুদরের কি নীচুদরের তাহার একটি অস্পষ্ট বোধ থাকে। তুলনা করিতে গেলেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

সাহিত্য-রসের মধ্যেও আনন্দের একটা উৎকর্ষাপকর্ষের বোধ আছে। একটা হাসির কবিতা পড়িয়া আমরা যখন হাসিয়া গড়াইয়া পড়ি আর রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি বা মহুয়া পড়িয়া যখন অন্তরকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলি, এই দুইএর মধ্যে কায়িক পরিণতির দিক দিয়া প্রফুল্লতার বিচার করিতে গেলে হাসির কবিতাটিতেই রসের আধিক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু অন্তরের স্নিগ্ধতা ও পবিত্রতার দিক দিয়া দেখিলে গীতাঞ্জলি বা মহুয়ার কবিতার সহিত তাহার কোনও তুলনা হয় না। বাগ্‌বিন্যাস, ছবি, ছন্দ, ঝঙ্কার, অর্থের তাৎপর্য্য বা দ্যোতনার দিক দিয়া একটি কবিতার কাব্যরসের অনেক বৈষম্য থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা ছাড়াও কোন্ কবিতার রসটি হৃদয়ের কোন্ গুহার নির্ঝর হইতে ঝরিয়া পড়িল, তাহার উপরে সেই রসের উচ্চতা বা নীচতা অন্ততঃ খানিকটা নির্ভর করে। অর্থাৎ যে জাতীয় ভাবকে আমরা বড় বলি, উঁচু বলি, যে ভাবগুলিকে আমরা সমস্ত প্রাণের সহিত শ্রদ্ধা ও সম্মান করি, যখন সেই ভাবগুলি রসসিক্ত হইয়া শব্দার্থের সাহিত্যে, অনুরণনে, 'ধ্বনিতে',

দ্যোতনায় আমাদের চিত্তকে ব্যাপ্ত করিয়া তোলে, তখন তাহাকে আমরা শ্রেষ্ঠ না বলিয়া থাকিতে পারি না। নিছক কায়িক আকর্ষণ সংসারে আছে এবং তাহার বর্ণনাতেও হয়ত কোনজাতীয় রস কোনও কৌশলী শিল্পী সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু সেই শ্রেণীর ক্লিন্ন কবিতার সহিত মহুয়ার 'পথবর্ত্তী' কবিতার আত্মহারা প্রেমের কোনও তুলনা হয় না।

"দূর মন্দিরে সিন্ধু কিনারে
পথে চলিয়াছ তুমি।
আমি তরু মোর ছায়া দিয়ে তারে
মৃত্তিকা তার চুমি।
হে তীর্থ-গামী তব সাধনার
অংশ কিছু বা রহিল আমার,
পথপাশে আমি তব যাত্রার
রহিব সাক্ষিরূপে।
তোমার পূজায় মোর কিছু যায়
ফুলের গন্ধ ধূপে॥

তব আহ্বানে বরণ করিয়া
নিয়েছি দুর্গমেরে।
ক্লান্তি কিছু বা নিলাম হরিয়া
মোর অঞ্চল ঘেরে।

যা ছিল কঠোর যাহা নিষ্ঠুর
তার সাথে কিছু মিলাই মধুর,
যা ছিল অজানা, যাহা ছিল দূর
আমি তারি মাঝে থেকে,
দিনু পথ পরে শ্যাম অক্ষরে
জানার চিহ্ন এঁকে।

বেলা চলে যাবে, একদা যখন
ফুরাবে যাত্রা তব,
শেষ হবে যবে মোর প্রয়োজন
হেথাই দাঁড়ায়ে র'ব।
এই পথখানি র'বে মোর প্রিয়,
এই হবে মোর চিরবরণীয়,
তোমারি স্মরণে রবো স্মরণীয়
না মানিব পরাভব।
তব উদ্দেশে অর্পিব হেসে
যা কিছু আমার সব॥"

রস-বিচারের সহিত ভাললাগার বিচারের সহিত এই যে আর একটি অবান্তর ভালমন্দর ইঙ্গিত আসিয়া ভাল মন্দ লাগার মধ্যে একটি জাতি বিভাগ আনিয়া দেয় ইহার কারণ কি? সে বিচার এ প্রবন্ধে আমি করিব না। কিন্তু ইহা যে অস্বীকার করা যায় না কেবল সেটুকুর

দিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই যে অর্থ-বোধ (value-sense) ইহা একেবারে চিরন্তনভাবে অবিকারী না হইলেও মোটামুটি-ভাবে ইহার বাণী একরূপ অবিকৃতই থাকে, মানবহৃদয়ের ও মানব-স্বভাবের গভীর পরিবর্ত্তন না হইলে এই অর্থবোধের বড় একটা পরিবর্ত্তন হয় না, সকল রসাস্বাদের পিছনে সর্ব্বদা সাক্ষিরূপে থাকিয়া সেই রসের চরিত্র সম্বন্ধে 'thus far and no further' এই মর্য্যাদার কশি টানিয়া দেয়।

মানুষের মধ্যে উচ্চ নীচের এই যে একটি শাশ্বত বোধ (value-sense) রহিয়াছে ইহা কেমন করিয়া উৎপন্ন হয়, মানুষের অন্যান্য বৃত্তির সহিত ইহার সম্পর্ক কি, রাষ্ট্র সমাজ প্রভৃতির বা দেশকালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার পরিবর্ত্তন হয় কিনা, এ সমস্ত আলোচনা করিবার এ স্থান নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাহিত্যের উদ্দেশ্য কোনও ধর্ম্ম বা নীতিপ্রচার নয়, সেইজন্য রসের এই অর্হত্বানর্হত্ব (value-sense) বোধের কথায় কেহ যেন একথা মনে না করেন যে, নীতিপ্রচার প্রচেষ্টার মধ্যে সাহিত্যরসের উচ্চনীচের পরিচয়।

// রূপ-রসাদির বোধ হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞান, বুদ্ধি, ইচ্ছা, রাগ, দ্বেষ, প্রীতি, অপ্রীতি, মত, প্রবৃত্তি, স্মৃতি, সংস্কার প্রভৃতি লইয়া যে অখণ্ড অনুভূতি-পুরুষটি গড়িয়া উঠেন তাহারি আত্মপ্রকাশে সাহিত্যের সৃষ্টি। সাহিত্য-সৃষ্টির উপকরণে যেমন শব্দ ও অর্থের সাহিত্যের বা মিলনের প্রয়োজন, তেমনি তাহার উপাদান-কারণ হইতেছে মানুষের আভ্যন্তরীণ জীবনের জৈব ও অজৈব সর্ব্ববিধ উপলব্ধির (experience)

অখণ্ড সাহিত্যে বা সম্মেলনে নির্ম্মিত অনুভূতিপুরুষ (Person or personality)।//

// যখন কোনও একটি খণ্ড উপলব্ধি এই সমগ্র অনুভূতিপুরুষকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়া সেই সমগ্রের রূপচ্ছায়াতে রূপান্তরিত হইয়া ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে, তখনই তাহা সাহিত্য হয়। এই অনুভূতিপুরুষটি কেবলমাত্র বুদ্ধিপুরুষের (conscious person) নাগালের বাহিরে। সেইজন্য শুধু বুদ্ধিদ্বারা আলোচনা করিয়া, তর্কের দ্বারা যুক্তির দ্বারা কোনও জিনিষ বুঝাইলে তাহাকে সাহিত্য বলে না। অনুভূতিপুরুষটির যে ছায়া, বেদনাবেগ, বুদ্ধিপুরুষটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়, তাহাই প্রধানতঃ সেই অনুভূতি পুরুষটির অজ্ঞাত শক্তিতে যখন শব্দার্থের মধ্যে বিধৃত হয়, তখনই সেটি হয় সাহিত্য। এখানে বুদ্ধিপুরুষটি যন্ত্রমাত্র, অনুভূতি-পুরুষটি যন্ত্রী।//

"এ কি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ি,
আমি যাহা কিছু বলিবারে চাই
বলিতে দিতেছ কই?
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই
সঙ্গীত স্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে।

*　*　*　*

এ যে সঙ্গীত কোথা হতে উঠে
এ যে লাবণ্য কোথা হতে ফুটে
এ যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তর বিদারণ!
নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণী ভরে।"

// এই অনুভূতি-পুরুষের স্বরূপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু কবি যদি অন্তরের অন্তঃপুরের মধ্যে হাত বাড়ান, তবে এই অরূপরতনের স্পর্শ অনুভব করিতে পারেন। সুখদুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রবৃত্তি এবং নানাবিধ ভাবনিচয় যেমন ইহার উপাদান, তেমনি একটি শাশ্বত অর্হত্বা-নার্হত্ব-বোধ (Value-sense) ইহার উপাদান। সেই জন্য এই অনুভূতিপুরুষটির প্রত্যেক অভিব্যঞ্জনার সঙ্গে সঙ্গে এই বোধটি ছায়া-লোকে আপনাকে প্রকাশ করে। অন্তর উপাদানের সাহিত্যে পরিস্ফূর্ত্ত একটি অনুভূতি-পুরুষ যখন কোন উপলব্ধিকে প্রকাশ করিবার ছলে

সেই উপলব্ধিটির মধ্য দিয়া আপনাকে প্রতিবিম্বিত করিয়া অপর একটি অনুভূতি-পুরুষের নিকট আপনাকে প্রকাশ করে, তখন এই উভয়ের পরিচয়ে যে আনন্দরস উচ্ছল হইয়া উঠে তাহাই সাহিত্যরস।//

//সেই জন্য কবির কাব্যে তাহার অনুভূতিপুরুষটির নানা উপাদান বিচিত্র-ভাবান্বিত হইয়া থাকে ও পাঠকের অনুভূতিপুরুষটির মধ্যেও সেই জাতীয় ভাব সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। এই হিসাবে সাহিত্য একদিকে যেমন শব্দ ও অর্থের তাৎপর্য্য, অপরদিকে তেমনি অন্তর উপাদানের সাহিত্যস্বরূপ অনুভূতি-পুরুষের আত্মপ্রকাশ ও অন্য অনুভূতিপুরুষের সহিত আত্মপরিচয়।//

সাহিত্যের দ্বারা দুইটি অনুভূতিপুরুষের পরিচয়ে আনন্দরসের উৎপত্তি হয় কিন্তু তাই বলিয়া আনন্দকেই সাহিত্যের স্বরূপ বলা যায় না। ইহা কেবলমাত্র সাহিত্যের "অব্যভিচার তটস্থলক্ষণ" অর্থাৎ সাহিত্য-সৃষ্টি মাত্রেই রসের সৃষ্টি হয়, কিন্তু সাহিত্যের স্বরূপ তাহা নহে।/সাহিত্যের স্বরূপ অনুভূতিপুরুষের আত্মপ্রকাশে ও আত্মপরিচয়ে। সেইজন্য এই আত্মপ্রকাশের বৈচিত্র্যে রসের জাতিগত ও আস্বাদগত বৈচিত্র্যের উৎপত্তি হয় ও তজ্জনিত রসের নানাবিধ তারতম্য অনুভূত হয়। রসের বেশীকমের দ্বারা সাহিত্যের প্রভেদ তেমন দেখা যায় না, যেমন দেখা যায় রসের বৈচিত্র্যে। বিভিন্ন কাব্যরসের সহিত অনুভূতি-পুরুষের বিভিন্ন স্বভাব বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হইয়া অনুভূতিপুরুষের বিভিন্ন রকমের প্রকাশ ও পরিচয় সম্পাদন করে। বাহিরের দিক দিয়া শব্দার্থের সাহিত্যকে সাহিত্য বলিয়াছি। অন্তরের দিক দিয়া

তেমনি সাহিত্য বলিতে কবি ও সহৃদয়ের সম্মিলনকেই সাহিত্য বলিতে হয়।

"অপূর্ব্বং যদ্‌বস্তু প্রথয়তি বিনা কারণকলাং
জগদ্‌ভাবপ্রখ্যং নিজরসভারাৎ সারয়তি চ।
ক্রমাৎ প্রখ্যোপাখ্যাপ্রসরসুভগং ভাসয়তি তৎ
সরস্বত্যাস্তত্ত্বং কবিসহৃদয়াখ্যং বিজয়তাৎ।"

অভিনব গুপ্ত।

অভিনবের ডায়েরী

রসের অলৌকিকত্ব

দিঙ্‌নাগ বলেন "আজকাল ব্যাপার বড় গুরুতর হয়ে উঠেছে। ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ, পুরাণ সমস্ত রসাতলে যাবার জোগাড় হয়েছে। কিছু ভাল লাগলেই লোকে বলে, আহা কি আনন্দ? কবি যখন কাব্য লেখেন তিনি বলেন. "আমার আনন্দে আমি লিখ্‌ছি, এ আমার লেখা, এ আমার লীলা।" একটা কাব্য ভাল কি মন্দ তার বিচার করতে গিয়ে লোকে বলে, এটা আমার ভাল লাগছে, এটাতে আমরা বড় আনন্দ পাচ্ছি, এটা খুব একটা উঁচুদরের কাব্য। শুধু ভাল লাগার দ্বারা কাব্যের বিচার করতে হবে, এওত বড় বিপদের কথা হ'য়ে দাঁড়াল? ভাল লাগার পিছনে ভাল-মন্দ, সত্য মিথ্যা, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট অনেক কারণ রয়েছে।

সে সমস্ত কারণের অনুসন্ধান না ক'রে শুধু ভাল লাগে ব'লেই কোন কবিতাকে শ্রেষ্ঠ, আর ভাল লাগে না ব'লেই কোন কবিতাকে নিকৃষ্ট বলা যায় না। আমার যেটা ভাল লাগে, তোমার সেটা ভাল লাগে না। তোমার যেটা ভাল লাগে, আর একজনের হয়ত সেটা ভাল লাগে না। এ ত এক এক জায়গায় এক এক রকম। ভাল লাগার'ত কোন একটা মাপকাঠি নেই, যার দ্বারা কাব্যের ভালমন্দ

বিচার করা চল্‌তে পারে। তর্কের ভূমিতে ব্যক্তিগত অনুভূতি ছাড়া আর একটি প্রামাণ্যের অস্তিত্ব মানতেই হবে। আনন্দ অনেক রকমেই হ'তে পারে। কবিতা পড়ে যেমন আনন্দ পাওয়া যায় তেমনি রসগোল্লা খেলেও আনন্দ পাওয়া যায়। তারপর এক বিষয়ে যখন দশজন আনন্দ পায়, তখন তাদের সকলের আনন্দ কিছু সমান হ'তে পারে না। আনন্দ পাওয়া, ভাল লাগা এ ত মানুষের ব্যক্তিগত ভাব, তা দিয়ে কখনও কোন সাহিত্যের বিচার চল্‌তে পারে না।

গোড়ায় একটি আনন্দবস্তু আছে, সেটী সকলেরই মধ্যেই এক; তার ভিন্ন রকমের প্রকাশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভাললাগা, মন্দলাগার সৃষ্টি হয়। ভাললাগা মন্দলাগার উপরেই যদি কাব্যের বিচার নির্ভর করে, এবং ভাললাগা ও আনন্দ যদি একই বস্তু হয়, তবে বৈষয়িক আনন্দের সহিত কাব্যানন্দের তফাৎ কোথায়? রসগোল্লা খেতে যে ভাল লাগে তাকেও তাহ'লে আনন্দ বলা চলে,—এবং সে আনন্দের সঙ্গে কাব্যের আনন্দের একতাই বা থাকে কোনখানে? কাব্যের ভাল লাগাকে আনন্দ আনন্দ বলে' সকলে যে তাকে একেবারে কুলীন করে তুল্‌ছেন, এটা নিতান্তই বাড়াবাড়ি।"

দিঙ্‌নাগ যখন এক নিশ্বাসে এই পর্য্যন্ত বলে থাম্‌লেন, তখন **ভট্টনায়ক** তার কথায় আপত্তি করে উঠ্‌লেন। ভট্টনায়কের মুখখানি একেবারে মুণ্ডিত, দাড়িগোঁফের চিহ্ন নেই; নাকটী বেশ উঁচু, বড় বড় দুটী চোখ প্রতিভায় জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে। যে বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন, তার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত তাঁর দৃষ্টি পৌঁছে যায়, অথবা

তাঁর কথার ভিতর একটু দার্শনিকতার ঝাঁজও আছে। তিনি বল্লেন, "আপনি এ কি বলছেন! কাব্যে যাকে লোকে ব'লে ভাললাগা সেটা ত রস, সেটাকে'ত লোকে চিরকালই আনন্দময় ব'লে থাকে। রস স্বগুণেই চিরকাল শ্রেষ্ঠ, বা কুলীন হ'য়ে রয়েছে। এ কৌলীন্যে আধুনিকতার গন্ধ বিন্দুমাত্রও নেই, রসও যা, আনন্দও তা। মনের ভাব উদ্রিক্ত হয়ে যখন একটি প্রকাশময়, আনন্দময়, চেতনার মধ্যে আত্মার বিশ্রাম ঘটিয়ে দেয়, তাকেই বলা যায় আনন্দ, তাকেই বলা যায় রস। রস বা আনন্দকে যখন আমরা একটা চল্‌তি ডাকনাম দিতে যাই, তখন তাকে বলি ভাললাগা।"

ভট্টনায়কের এই কথা শুনে **দিঙ্‌নাগ** একটু মুচ্‌কি হেসে বল্লেন, "আমার বুদ্ধিটা কিছু মোটা। আমরা যে সত্যকে আঁকড়ে ধরি তাকে একটু মোটা রকমেই ধরি। আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের এমন শক্তি নেই যে, তার সাহায্যে আমরা কোন বস্তুকে চিনে নিতে পারি। তাই আপনাদেরও সমস্ত হেঁয়ালির কথা আমরা বুঝতে পারি না। আমরা যেটা পাই, সেটা হাতে হাতে পাই। কৌলীন্য ও অকৌলীন্যের উপমার ছায়ায় আশ্রয় নিলে ত কোন লাভ নেই। দেখতে হবে যে ভাল লাগা জিনিসটা এক রকম ছাড়া দু'রকম হতে পারে কি না? একবার যদি বল্লেন "ভাললাগা" তবে তার মধ্যে অন্য কোন রকমের ভেদ ত আনবার জো নেই। পেটুকের মিষ্টান্ন ভাল লাগে, কৃপণের ধন ভাল লাগে, দাতার দান ভাল লাগে—এ সবই ত ভাললাগা। ভাললাগা—হিসাবে ত এদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কারণ ভাললাগা ত একটা জিনিস,

তার মধ্যে তোমরা পার্থক্য আন্‌বে কোনখান থেকে ? তবে যে তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সেটা বস্তুর পার্থক্য। "ভাললাগার" বস্তুর পার্থক্য অনুসারে ভাললাগার পার্থক্য দেখ্‌তে পাই। কিন্তু ভাললাগার সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নেই। আর যদি কোন ভেদ থাকৃত, তবু তা দেখ্‌বার কারও কোন সাধ্য ছিল না, কারণ ভাললাগা মন্দলাগা ত যার যার ব্যক্তিগত; তার'ত কোন একটা সামাজিক মানদণ্ড থাকৃতে পারে না। কাজেই ভাললাগার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করতে গেলে সেটা তার বিষয়কে অবলম্বন করেই করতে হবে।"

ভট্টনায়ক উত্তর করিলেন, "দেখুন দিঙ্‌নাগ বাবু, যে ভুলটা সকলে সাধারণতঃ করে' থাকে, সেটা আপনিও করেছেন দেখছি ? কাব্য নাটকের যে রস বা আনন্দ সেটাকে "ভাললাগা" বল্লে এই দোষ হয় যে, লোকে অন্য পাঁচ রকম ভাললাগার সঙ্গে সেটাকে ঘুলিয়ে ফেলে, একটা মহাগণ্ডগোল বাধিয়ে দেয়। আনন্দ বল্লেই বা রক্ষা কোথায় ? কারণ, কাব্যের আনন্দটাকে যেমন অপভ্রষ্ট ভাবে অনেক সময় ভাললাগা বলা হয়ে থাকে, তেমন ইন্দ্রিয়জ ভাললাগাকেও আনন্দ নাম দিয়ে আমরা অনেক সময়ে তার মান বাড়িয়ে দিয়ে থাকি। অথচ, এই লৌকিক আনন্দ বা ভাললাগা আর কাব্যের আনন্দ বা ভাললাগা—এ দুয়ের মধ্যে স্বর্গ-মর্ত্ত্য প্রভেদ। কাজেই গোড়াকার সেই কথাটা ঠিক না হয়ে গেলে, এ বিষয়ে আমরা যতই তর্ক করি না কেন, কোনও মীমাংসা হবে না—শুধু ভাগাসিদ্ধি বা Fallacy of Four terms হয়ে যাবে।

ভট্টনায়কের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই রুদ্রটবাবু বলে উঠলেন যে, "এদিক ওদিক ক'রে কথা কইলে ত চল্‌বে না, যে কথাটা উঠেছে সেইটার উত্তর দিন। ভাললাগার মধ্যে আপনারা কেমন ক'রে ভেদ দেখাতে পারেন, সেটা একবার বুঝিয়ে দিন ত দেখি।"

মেঘ্‌লা দিনের গুমোট্ গরমের মধ্যে দ্বিপ্রহরের মত তাঁর মুখের দীপ্তিতে একটা তাপও ছিল, তাপে তাঁর মুখখানাকে যেন একটা পিরামিডের মত নিরেট করে তুলেছিল।

ভট্টনায়ক বল্লেন "তাইত আমি এই বল্‌তেই যাচ্ছিলাম যে, সাধারণতঃ যাকে "ইন্দ্রিয়জ ভাললাগা" বলা যায়, তার মধ্যে কোন বিশেষ তফাৎ নেই—সে কথা ঠিক। রসগোল্লা খেতে ভাললাগাও যা আর পোলাও খেতে ভাললাগাও তা। অর্থাৎ শুধু ভাললাগার দিক্ থেকে দেখ্‌তে গেলে, এ দুয়ের মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ নাই। কাজেই তাদের মধ্যে পরস্পরের যে ভেদ, সেটা কেবল বিষয়ের ভেদ। এই ইন্দ্রিয়জ "ভাললাগা" বা ভোগের বিচার করতে গেলেই আমরা তার বস্তুর বিচার ক'রে থাকি। এই ইন্দ্রিয়জ ভোগের দ্বারা আমরা জগতের সঙ্গে আমাদের যোগস্থাপন করি, এবং তাই নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করি।

কাজেই এই ইন্দ্রিয়জ ভোগ সর্ব্বদাই বহির্মুখী। সেখানে শুধু ভাললাগাতেই বিশ্রাম নেই, ভাললাগার বস্তুটি কাছে রাখা চাই, পাওয়া চাই, আপনার করা চাই। এই বস্তুটি এক সময়ে দশজনের কাছে থাক্‌তে পারে না। কাজেই এই ভাললাগার বস্তু নিয়ে লোকের

মধ্যে পরস্পর বিরোধ বেধে যায়। কাজেই এখানে প্রত্যেকের ভাললাগার জিনিসগুলিকে তার আয়ত্তাধীন করবার জন্য কোনখানে ভাললাগা উচিত নয়, তার একটা সীমা স্থির করবার দরকার হয়; এবং এই বস্তু-বিচারই ভাললাগার ভাল-মন্দর মাপ-কাঠি হয়।

ভাললাগার সঙ্গে বস্তু এত মাখামাখি হয়ে রয়েছে যে, বস্তু বাদ দিলে ভাললাগা ধ্বংস হয়ে যায়। এই ভাললাগাটি বজায় রাখ্‌বার জন্য, বস্তুগুলিকে পরস্পরের মধ্যে আপোষে ভাগাভাগি ক'রে দেবার জন্য নিয়মের দরকার। এই নিয়মের উপরেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এটা একদিকে যেমন বিধিনিষেধ বা Moralityর ক্ষেত্র অপরদিকে তেমন রাষ্ট্র-সংযম বা Stateএর ক্ষেত্র, ধর্ম্ম বা Lawএর ক্ষেত্র। ভাল লাগা, মন্দ লাগা, বা ব্যক্তিগত অনুভূতি দ্বারা কাজের ভাল মন্দর মাপকাঠি এস্থলে স্বতন্ত্র। কাব্য সম্বন্ধে ত একথা বলা চলে না, কারণ এ রাজ্যে ত বস্তুর হুড়াহুড়ি নেই; সেখানে বিশ্রাম হচ্ছে আনন্দে, রসে, মাধুর্য্যে—"সত্ত্বোদ্রেক-প্রকাশানন্দময়-সংবিদ্ বিশ্রান্তিসতত্ত্বেন ভোগেন যুজ্যতে",—এটা একটা আনন্দময়, রসময় প্রকাশময় বিশ্রাম। কাব্যের রস উপভোগ করাতে কোন দ্বন্দ্ব হতে পারে না, কারণ এস্থলে রসের মধ্যেই রসের বিশ্রাম,—বস্তু নিয়ে ত এখানে মারামারি নেই। কাজেই অন্য বিষয় সম্বন্ধে ভালমন্দ বল্লে যা বুঝা যায়, এখানে ভালমন্দ বল্লে তা বুঝা যায় না।"

রুদ্রেট—"আপনি কি বলতে চান যে, কাব্যরসের জন্য কোন বস্তুর দরকার হয় না? এ ত বড় অদ্ভুত কথা ব'লে মনে হচ্ছে।

আমরাও জানি যে অন্য আর পাঁচটা শাস্ত্রে যে সমস্ত বিষয়ের কথা বলা হয়, কাব্যের বিষয় ও তাই। অন্য পাঁচটা শাস্ত্র যেমন বস্তুগত, কাব্যও তেমনি। তবে তফাৎ এই যে, কাব্য সে কথাগুলিই একটু সরস ক'রে বলে। শব্দ আর অর্থ নিয়েই'ত কাব্য ; বস্তু ছাড়া শব্দও হয় না, অর্থও হয় না। কাজেই বস্তুর সঙ্গে ও কাব্যের সঙ্গে যে সম্পর্ক, সেটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাকে কোন রকমে এড়ানো যায় না, তাই অস্বীকার করাও চলে না।

এই দেখুন না, অমুকের কবিত্বশক্তি আছে বল্লে আমরা কি বুঝি। না, তার মনে নানারকমের বিষয় বা বস্তুর উদয় হয় আর সেগুলি প্রকাশ করবার মত শব্দ তার চট্‌পট্ মনে পড়ে। কাজেই অন্য শাস্ত্রের সঙ্গে কাব্যের যে বড় বেশী একটা তফাৎ আছে, তা নয়। তবে হাঁ, আপনি বল্‌তে পারেন যে কাব্যে যেটুকু বলা হয়, সেটুকু বেশ সরস করে বলা হয়। এছাড়া কাব্য সম্বন্ধে আর অন্য কোন রকম দাবীই আপনারা করতে পারেন না।"

ভট্টনায়ক—"বেশ ত আপনার কথা না হয় মেনে নেওয়া গেল, তাতে আমি কিছু ক্ষতি দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আপনি বল্‌ছেন যে অন্য শাস্ত্রের সঙ্গে কাব্যের এইটুকু মাত্র তফাৎ যে কাব্যের মধ্যে রস আছে। আমিও ত ঠিক সেই কথাই বল্‌ছি যে রস থাকলেই বলব কাব্য, নৈলে শুধু শব্দার্থ যতই চমৎকার হোক না কেন, তাকে কখনও কাব্য বলব না। শব্দার্থকে কাব্যের শরীর বলুন, তাতে আমার আপত্তি নেই,—তবে তার প্রাণ হচ্ছে রস। শরীর ছাড়া প্রাণের

অভিব্যক্তি দেখ্‌তে পাই না বটে, তাই ব'লে শরীর এবং প্রাণ একই জিনিষ, একথা বল্‌তে পারিনা। প্রাণ না থাকলে শরীর একটা পাঞ্চভৌতিক বিকার। সেটা খুব মোটা রকমের বস্তু,—সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই ব'লে একথা বলা চলবে না যে, বস্তু থেকে রস হয়েছে, শরীর থেকে প্রাণ হয়েছে। প্রাণ যেমন শরীরের মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে, রসও তেমনি শব্দার্থের মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে। প্রাণ যেমন নিজের বলে নিজের উপযোগী দেহ নির্ম্মাণ করেছে, তেমনি রসও তার আপন উচ্ছ্বাসে আপনার উপযোগী শব্দার্থের সৃষ্টি করে, এবং তারই অবলম্বনে আপনাকে প্রকাশ ক'রে থাকে। যেমন প্রাণের আনন্দ থেকে অনন্ত জীবদেহের সৃষ্টি হয়, প্রাণের মধ্যে যেমন প্রাণের আর কোন দেহ নাই, তেমনি রসের মধ্যেও রসের আর কোন দ্বিতীয় দেহ নাই। একে আনন্দ বল্লেও বলা যায়, চিৎ বল্লেও বলা যায়, এটা এমন একটা অখণ্ড সত্তা যে, এখানে চিৎ আর আনন্দের কোনও প্রভেদ নেই। এখানে দুই বল্‌তে কিছুই নেই, একটা অখণ্ড রসোপলব্ধি, আনন্দ ছাড়া আর কিছু নেই। এই রস ও আনন্দ একই কথা। আপনার খেলার মধ্যে, লীলার মধ্যে এ আপনিই প্রকাশ হয়ে রয়েছে। একে প্রকাশ করবার জন্য কোন প্রমাণান্তরের আবশ্যক হয় না। একে কেউ উৎপন্ন করে না। প্রকাশও করে না। এর উপর কাহারও কোন হাত নেই—এমন কি, যে কবির মধ্যে এর আবির্ভাব হয়েছে, তারও নয়।

"রাখ কৌতুক নিত্য নূতন,
ওগো কৌতুকময়ী।
আমার অর্থ, তোমার তত্ত্ব,
বলে দাও মোরে অয়ি!

আমি কিগো বীণাযন্ত্র তোমার,
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্চ্ছনাভরে গীত-ঝঙ্কার
ধ্বনিছে মর্ম্ম মাঝে?

আমার মাঝারে করিছ রচনা,
অসীম বিরহ, অপার-বাসনা,
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় বাজে?

মোর প্রেমে দিয়ে তোমার রাগিণী,
কহিতেছে কোন্ অনাদি কাহিনী,
কঠিন আঘাতে, ওগো মায়াবিনী
জাগাও গভীর সুর!

হবে যবে তার লীলা অবসান,
ছিঁড়ে যাবে তার, থেমে যাবে গান,
আমারে কি ফেলে করিবে প্রয়াণ
তব রহস্যপুর?"

এবার **দিঙ্‌নাগ** একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠে তাঁর মোটা হাতখানা টেবিলের উপর চাপ্‌ড়ে বল্লেন যে "কবিতা দিয়ে কবিতার সমর্থন, এও যেমন এক বিষম argument in a circle, তেমনি রসকে আনন্দ বলাও একটা ভয়ানক আজগুবি ব্যাপার। রসমাত্রই আনন্দাত্মক, এটুকু পর্য্যন্ত স্বীকার করতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাহলে রসকে কখনও আনন্দ বলা চলে না, কারণ তাহলে রসমাত্রই আনন্দাত্মক না ব'লে আনন্দমাত্রই আনন্দাত্মক বলা যেতে পারে, কিন্তু সে কথার কোন অর্থ থাকত না। রসো বৈ সঃ রসোঽহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি—পরমেশ্বর রসস্বরূপ। পরমেশ্বরের রস পেয়েই জীব আনন্দিত হয়। এখানেও রস আর আনন্দ যে একই বস্তু, এমন বলা হয়নি। বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে পার্থক্য, রস ও আনন্দের মধ্যেও সেই প্রভেদ।"

ভট্টনায়ক। "রস আনন্দাত্মক বল্লেই যে রস আনন্দ হতে পারে না, একথা আপনি কি বুদ্ধিতে ঠিক করলেন। একে সংস্কৃতে বলে বিকল্প—"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ"। রস ও আনন্দ এই উভয়ের মধ্যে যে বাস্তবিক কোন পার্থক্য আছে তা নয়, ওটা একটা কথার জের মাত্র। লোকে বলে "রাহুর মাথা" "পুরুষের চৈতন্য", তাই বলে কি রাহু মাথা ছাড়া একটা স্বতন্ত্র বস্তু, না পুরুষ চৈতন্য ছাড়া আর কিছু। রসের আনন্দই বলুন আর রস আনন্দাত্মকই বলুন, ও একই কথা, এবং ওর মানে এই যে রস ও যা' আনন্দও তা'। "রসো হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" এর মানে এ নয় যে, ব্রহ্মের রস পেয়ে লোক আনন্দিত হয়, এবং রস আর আনন্দ এক বস্তু নয়। কারণ,

আনন্দ ছাড়া যে আর কোন রস স্বরূপ আছে, তা উপনিষদের সিদ্ধান্ত নয়। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তার মানে এই যে, সৎ, চিৎ এবং আনন্দ, এই তিনটিই পরস্পর অভিন্ন, একতত্ত্ব। যাকে রস বলছ, তাকেই আনন্দ বল্‌তে হবে। কারণ, আনন্দ ছাড়া "রসতত্ত্ব" ব'লে ব্রহ্মের আর কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব নেই। পুত্রকে পেয়ে আনন্দ পাই অতএব পুত্র আনন্দময়, এসমস্ত ছেলেমানুষী তর্কের আড়ম্বর করে শুধু কথা বাড়াচ্ছেন মাত্র, কারণ আমরা ত বলিনি যে—"রস পেয়ে আমরা আনন্দ পাই" আমরা বলছি যে রসও যা আনন্দও তা; আনন্দময় হচ্ছে রসের লক্ষণ। কাজেই কোন্ রসটা শ্রেষ্ঠ, কোন্ রসটা নিকৃষ্ট, একথা বলা চলে না,—এবং বাহিরে থেকে একটা রসের আদর্শও খাড়া করা যেতে পারে না। কারণ, সে যে সকলের চেয়ে উঁচুঁতে, তার ত কোন মাপকাঠিতেই নাগাল পাওয়া যাবে না। সে যে ব্রহ্মস্বাদসহোদর, অন্য ভাললাগার সঙ্গে ত রসের কোন তুলনা হ'তে পারে না। অন্য ভাললাগার সঙ্গে আমাদের প্রয়োজনের সম্বন্ধ। কাজেই সেখানে ভাললাগার সঙ্গে একটা মন্দ লাগা রয়েছে, কিন্তু কাব্যের রসের মধ্যে কোন মন্দ লাগা নেই। এইখানে সর্ব্বদাই স্বর্গ-মন্দাকিনীর রসনির্ঝর উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। তাতে আমাদের দৈনিক পানাবগাহনের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না এবং সেই জন্য তাকে আমরা এমন বিশেষ করে আনন্দময় ব'লে আর সব রকম আনন্দ বা ভাললাগার থেকে স্বতন্ত্র আসনে বসাতে পারি। কবি এ বিশ্বাসে এতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, সহস্র আঘাত করলেও তিনি ফুলের

মুচকি হাসিতে তার উত্তর দিয়ে থাকেন, কখনও কৈফিয়ৎ দেন না। "তারা হেসে যায়, তুমি হাস বসে মুচকি" যে দেহে কবির কৈফিয়ৎ লেখা হয়, সেটা তাঁর মর্ত্তের দেহ,—তাঁর দেব দেহে ছায়ার কলঙ্কটুকুও নেই। সেখানে শুধু আলো, শুধু উৎসব, শুধু আনন্দ। মর্ত্তের দেহে হুল ফোটে বলেই সেখানে কৈফিয়তের প্রয়োজন হয়।"

দিঙ্‌নাগ—"অন্য পাঁচরকম অনুভূতি বা আনন্দ থেকে রসকে তোমরা কেমন করে এমন স্বতন্ত্রভাবে অলৌকিক ক'রে দেখতে চাও তা তোমরাই বুঝতে পার। তোমাদের হেঁয়ালী ছন্দের আবরণের মধ্যে থেকে শুধু Mysticismএর বুলি আওড়ালে ত চলবে না। রস যখন অনুভূতিগ্রাহ্য, তখন রসও বস্তু। রসানুভূতির জন্য প্রথম চাই বস্তু, দ্বিতীয় চাই কারণ, তৃতীয় চাই কর্ত্তা। জ্ঞান যেমন বস্তুকে ধ'রে জন্মায়, শূন্যকে ধরে জন্মায় না,—সেইরূপ ভয়, বিস্ময়, করুণা, ঘৃণা, প্রীতি প্রভৃতি রসও বস্তুর আশ্রয়েই জন্মায়। বস্তু আশ্রয় ছাড়া জন্মাতে পারে না। যে বস্তু হ'তে কোন বিপদের আশঙ্কা একেবারেই নেই তাকে দেখে ভয়ের অনুভূতি হয় না। কবিতা বিশেষ লিখে বা প'ড়ে যে আনন্দানুভব হয়, তাতে বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ এবং অতীতের বহুতর স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। রসমাত্রই হয় বর্ত্তমান বস্তুর সাক্ষাৎকার, না হয় পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ বস্তুর সাক্ষাৎকারের স্মৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়, শূন্য হ'তে কিংবা কেবল মনের ভিতর হইতে আপনি জন্মায় না। কবি মাত্রেরই যেমন আত্মপ্রকাশে একটা আনন্দ আছে, তেমনি পাঠক মাত্রেরই পূর্ব্বানুভূত বস্তুকে অবলম্বন করে তার স্মৃতিতে আনন্দ হ'তে

পারে, কিন্তু সে আনন্দ নিতান্তই ব্যক্তিগত, তার দ্বারা কবিতার উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার করা যায় না। পদাবলী গান শুনে একজন লম্পট অজস্র অশ্রুপাত করেছিল। সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বল্লে,—'কীর্ত্তনীয়া যখন বঁধু বঁধু বলে ডাক্‌ছিল তখন আমার একব্যক্তির কথা মনে প'ড়ে গেল, যে সেও আমাকে এইভাবেই ডাক্‌ত।'

নানা লোকে নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন কবিতা বা ভিন্ন ভিন্ন কবিকে ভালবাসে—এই সকল কারণের মধ্যে কোনটা রসানুভূতির প্রমাণ, আর কোন্‌টা অবান্তর বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত, ইহা দ্বারাই কোনটি কাব্যবিচারে গ্রহণীয় আর কোনটি বা বর্জ্জনীয় তাহার মীমাংসা হইবে। কেবল ভাললাগা বা না লাগার দ্বারা এ বিচার হতে পারে না।"

ভট্টনায়ক—"আবার "রস" শব্দের অর্থ গুলিয়ে ফেলে ভাগাসিদ্ধি ক'রে ফেলবার যোগাড় করেছেন দেখছি। আপনি যে বিস্ময় ভয় প্রভৃতিকে রস নাম দিয়ে এখানে তর্ক জুড়ে দিয়েছেন, সেগুলি অনুভূতি বা Feeling মাত্র। কিন্তু আমরা যে কাব্যরস সম্বন্ধে এখানে বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছি, সেটা হচ্ছে একটা অলৌকিক প্রকাশ। কারো বিস্ময়, ভয় বা করুণা নয়। কারণ সেখানে সমস্ত রসের বিশ্রাম হচ্ছে আনন্দে। সেখানে ভয়ে ভীতি নেই,—আছে কেবল তৃপ্তি, আনন্দ। বিয়োগান্ত ব্যাপারের অভিনয়ে আমাদের চোখে জল আসে বটে, কিন্তু সেটা দুঃখের অশ্রুজল নয়, সেটা অন্তরের একটা সরস ভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। তাতে যদি লোক দুঃখই পাবে তবে তা শোন্‌বার জন্য লোকের এত আগ্রহ হবে কেন।//

"করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।
করুণেষু যদা দুঃখং ন কোঽপি স্যাত্তদুন্মুখঃ
অশ্রুপাতাদয়স্তদ্বৎ দ্রুতত্বাচ্চেতসো মতাঃ।"

কাজেই লোকের বিস্ময়, ভয়, শোক, বল্‌তে যে জিনিষটা বোঝায় কাব্যের বিস্ময়, ভয়, শোক, বল্‌তে তা বোঝায় না। এটা একেবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু—কাজেই লৌকিক বিস্ময় ভয় সম্বন্ধে সেকথা খাটে, যা নিয়ে আপনি তর্ক করছেন, তার একটিও এখানে খাটবে না। এই রসানুভূতি জিনিসটা একেবারেই ব্যক্তিত্ব-শূন্য বা Impersonal, ইহার কোন বেদ্য বস্তু নাই বা বিদিত বস্তুও নাই। সেই জন্য প্রাচীনেরা একে বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য বলে বর্ণনা করেছেন কারণ এতে কোন ও ব্যক্তিগত সাংসারিক সুখ-দুঃখের লেশমাত্রও নাই।

কাব্যের রস, বেদনা, অপর কোনও ব্যক্তির স্বাভাবিক সুখদুঃখের সত্য কাহিনী নয়, কারণ সেগুলি সমস্তই এমন কাল্পনিক যে অপরের ব্যথা মনে করে যে তার সঙ্গে সহানুভূতি করব, তার উপায় নেই। অথচ এটা কবি বা পাঠকের নিজের দরদও নয়, তাই ওটা পরের বটে, পরেরও নয়,—আবার নিজের হয়েও নিজের নয়। সাধারণতঃ Feeling বা অনুভূতি বল্‌তে আমরা যা বুঝি, তা সকল সময়েই বাস্তবকে অবলম্বন ক'রে উৎপন্ন হয়; তা সকল সময়েই আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে, কিন্তু কাব্যের আলম্বন উদ্দীপন

ত সে রকম নয়। এখানে সবই অসম্ভব, সবই কাল্পনিক, তারা সত্য বা বাস্তবিক ভাবে স্থূল জগতে নেই বলেই তাদের সম্বন্ধে লৌকিক প্রত্যক্ষ চল্‌তে পারে না, এবং প্রত্যক্ষ চল্‌তে পারে না বলেই তার সম্বন্ধে অনুমান বা স্মৃতিও চল্‌তে পারে না।

কীর্ত্তনীয়ার গান শুনে যার নিজের পিয়ারার কথা মনে হয়ে চোখ দিয়ে জল পড়েছিল, তার সে ব্যাপারটাকে যদি কাব্যরসের আস্বাদন বলা যায়, তাহলে যে কোন স্মৃতি মাত্রই কোন না কোন স্মারক বস্তুর ব্যাপারের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে কাব্য হয় বল্‌তে হয়।

ব্যক্তিগত কোন সুখদুঃখের স্মৃতিই কাব্য রসের নিয়ামক বা সম্পাদক নয়। বাস্তব বলেই সেগুলিকে আমরা স্মৃতি বল্‌তে বাধ্য। কাব্যরস'ত স্মৃতি নয়, কাহারও সেটা আপনার জীবনের ব্যক্তি-সাক্ষিক ঘটনা নয়। অনেক সময় অবশ্য কাব্যরসের সঙ্গে আরও পাঁচরকম আনন্দ জড়িত থাকে হয়ত বা কোনও খানে পূর্ব্বানুভূত কোনও ঘটনার আভাস থাকে, কোনওখানে বা একটা ধর্ম্মের ভাব মিশ্রিত হয়ে থাকে। তা'ত হবেই, সবরকমের ভাবই যে মানুষের মধ্যে সব সময় খেল্‌ছে। কিন্তু তাই বলে'ত সমস্ত গুলিকেই কাব্যরসের কোঠায় ফেলা যেতে পারে না।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনে যদি কৃষ্ণের কথা মনে হয়ে ভক্তিতে কেউ বিভোর হয়, তাহলে সেটাকে যে আমরা কোনও রকমে কাব্যরসের আস্বাদ বলব, এবং সেই খাতিরে যে কাব্যত্ব হিসাবে পদাবলীর প্রশংসা করব, তার সম্ভাবনা মাত্র নেই। কিন্তু সেই

পদাবলী শুনে যদি অনির্দ্দিষ্টভাবে নরনারীর প্রেমের সঙ্গীতটি প্রাণে বেজে উঠে, তবে সে আনন্দকে আমরা কাব্যরসের আস্বাদ ছাড়া আর কিছুই বল্‌তে পারিনে। কাব্যরসের বৈচিত্র্যই এই যে, এখানে সমস্ত ব্যক্তিগত বিশেষভাব একেবারে লয় পেয়ে নির্ব্বিশেষের আনন্দলীলা চলতে থাকে। বিধাতার বাস্তব জগতের অনেক উর্দ্ধে এর স্থান। কবিই সেই জগতের প্রজাপতি, এবং আনন্দ-পিপাসু রসিক মাত্রই তাঁর প্রজা।

"অপারে কাব্য সংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং অথেদং পরিবর্ত্ততে ॥"

ভট্টনায়কের এই কথা শেষ হইতেই রুদ্রট্ জিজ্ঞাসা ক'রে উঠলেন যে, আপনি যা বলছেন তাই যদি হবে, তাহলে কাব্য হ'ল কি না হ'ল, তার বিচারক হবে কে? এবং কাব্যের উদ্দেশ্যই বা কি? আকাশে বিদ্রূপের হাসি ঝিক্‌মিক্ করে উঠল এবং একটা দমকা বাতাসে রাশীকৃত ঝরাপাতা আমাদের গায়ে উড়ে এসে পড়ল—সেদিনকার মত কথা বন্ধ হয়ে গেল।

বর্ষাকাব্যের ক্রমবিকাশ।

মনে পড়ে আজ প্রায় পনের বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের অনেক মাসিক পত্রে সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতা সম্বন্ধে একটা আলোচনা উঠেছিল। প্রতিবাদী পক্ষ থেকে এই একটা আপত্তি উঠেছিল যে সাহিত্য বস্তুতান্ত্রিক হওয়া চাই। রবীন্দ্রনাথ বস্তুতান্ত্রিক নন, এজন্য তাঁর প্রতিও অনেক রকম কটাক্ষ হয়েছিল। বস্তুতান্ত্রিকতার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে অনেক আলোচনার মধ্যে অজ্ঞাত ও অখ্যাত ভাবে আমিও একটু সামান্যভাবে যোগ দিয়েছিলুম এবং সবুজ পত্রে অভিনবের ডায়েরী নামে একটা প্রবন্ধ ছেপেছিলুম। এ দ্বন্দ্ব যে আজও মিটেছে তা নয়, অতি আধুনিক সাহিত্যের মধ্যেও প্রগতি, কল্লোল, ধূপছায়া, কালি-কলম, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি একত্র হয়ে বেশ একটা ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি ক'রে তুলেছে। বিবাদটা এখন আর বস্তুতান্ত্রিকতা এই নাম অবলম্বন ক'রে চল্‌ছে না, কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে বিবাদটার মূলে এই রকম মতের স্বপক্ষে বিপক্ষে টানাছেঁড়া চলেছে।

বস্তুতান্ত্রিকতা কথাটা আমাদের দেশের কোন প্রাচীন কথা নয়। ইংরেজী সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে কোনও ইংরেজী ভাবের বাঙ্গালা তর্জ্জমার চেষ্টাতেই এই শব্দটির উৎপত্তি। আমার সন্দেহ হয় যে ইংরেজীতে যে realism ব'লে একটা শব্দ চলে, সেইটা থেকেই

বাঙ্গালায় এই শব্দটির উৎপত্তি। ইংরেজী সমালোচনার ধারা বাঙ্গালা সাহিত্যে কিছুদিন ধরেই প্রয়োগ করবার চেষ্টা চলেছে, এবং সেই চেষ্টার ফলে ওদেশে যে সব ঝগড়াঝাঁটি চলেছে আমরাও বাঙ্গালা ক'রে সেই সব ঝগড়াঝাঁটি সুরু করেছি। ঝগড়ার সুরুতেই ঝগড়ার বুলিগুলি তর্জ্জমা করা নিতান্তই দরকার হ'য়ে পড়েছিল।

আধুনিক কালে ইংরেজী ভাষায় realism বলে যে শব্দটি চলে, সেটি সাহিত্য থেকে দর্শনশাস্ত্রে এসেছে কি দর্শন শাস্ত্র থেকে সাহিত্যে গেছে, সাহিত্যিকদের সঙ্গে এ নিয়ে আমি একটা নূতন বিবাদ আরম্ভ কর্ত্তে চাই না; তবে আমার মনে হয় যে আধুনিক দর্শনশাস্ত্রে realism বা neo-realism ব'লে যে শব্দটি পাওয়া যায় তার অর্থটি বেশ পরিস্কার এবং ব্যাপক। আমার আরও মনে হয় যে সেই অর্থটি ধীরপ্রসারিত নানা গৌণ অর্থে সাহিত্যিক realismএর সকল অর্থকেই পরিস্কার ক'রে দেয়।

আমরা যখন নানা ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে নানা বস্তুকে জানি তখন এই জানার সঙ্গে যে বিষয়টি জানি তার কি সম্পর্ক,—সেই প্রসঙ্গে এই realism বাদটি আধুনিক দর্শনশাস্ত্রে উঠেছে। প্রাচীন ইয়োরোপীয় দর্শন শাস্ত্রেও realism ব'লে একটি মত ছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলা প্রাসঙ্গিক হবে না। কিছুদিন ধ'রে ইয়োরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থীদের মধ্যে এই নিয়ে একটা ঘোরতর কলহ উঠেছে যে, যে বিষয়টি আমরা জানি, সে বিষয়টির স্বরূপ ও প্রকৃতি আমাদের জানা দ্বারা কোনও রকমে পরিবর্ত্তিত বা সংস্কৃত

হয় কি না। নবীনেরা বলেন যে রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ যা কিছু আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, সেগুলি ঠিক তেমনটি হ'য়েই বাইরে রয়েছে। আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়ের জানালা দিয়ে যখন সেগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হয়, তখনই সেগুলিকে আমরা "জানি" ব'লে ব্যবহার করি। জানা ব'লে জিনিষটা যদি সংসারে একেবারেই না থাক্‌ত, তথাপি জান্‌বার বিষয়গুলির অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতির কোনও রূপ ক্ষতিবৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন হ'ত না। দৈহিক বা আন্তরিক নানাপ্রকার ভাবপরম্পরা ও সুখদুঃখাদি বোধ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

জ্ঞেয় বিষয় মাত্রই আপন আপন স্বরূপে সর্ব্বদাই বিদ্যমান রয়েছে। মন সেগুলিকে কোনও রকমে আপন ইচ্ছায় গড়েপিটে নিতে পারে না, বা পরিবর্ত্তন কর্ত্তে পারে না। মনের কাজ হচ্ছে সেগুলিকে শুধু জানা। আমি এই জন্যে এই realism মতটিকে বাঙ্গালায় তর্জ্জমা কর্ত্তে গেলে তাকে যথাস্থিতত্ববাদ বলব—অর্থাৎ যেটি যেমন আছে সেটি ঠিক তেমনই আছে; আমাদের জানার দ্বারা যথাস্থিত বস্তুর কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। ইহাদের বিপরীতবাদী-দিগকে idealist বলা যায়। তাঁহারা বলেন যে জানার সঙ্গে জানার বিষয়ের এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে যে জানা ছাড়া বিষয়টি যে কি তা বলবার কোনও উপায় নেই।

জানার মধ্য দিয়েই বিষয়টি নিজকে প্রকাশ করে, তাই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতির কোনওটিই জানার সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ

ছিন্ন হ'য়ে, আলগা হ'য়ে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে এমন কথা বলার উপায় নেই। কারণ,—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ব'লে যা কিছু আমরা জানবার বিষয় বলি,—সেগুলি সবই ত জানারই বিভিন্ন রূপ, তাই জানা ছাড়া সেগুলির কোনও পৃথক্ অস্তিত্ব বোঝ্‌বার উপায় নেই। এঁদেরই অনেকে আবার এমনও বলেন যে জ্ঞানের সঙ্গে বিষয়ের যে সম্পর্ক সেটা পরস্পরাপেক্ষ একটা জীবন প্রবাহের মত। সকালে যেটি বর্ণহীন, গন্ধহীন কুঁড়ি ছিল, বৈকালে সেইটিই রূপে, গন্ধে ভরপুর, কাল যে বীজটি প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় মাটির মধ্যে পড়েছিল, আজ সেইটিই সবুজ অঙ্কুর হ'য়ে মাটি ভেদ ক'রে উঠেছে। সমস্ত জীবনের ব্যাপারেই আমরা দেখ্‌তে পাই যে **থাকা** ব'লে কোনও জিনিষ নেই, কেবল **হওয়ারই** স্রোত চলেছে। আমাদের সঙ্গে আর আমাদের জানার সঙ্গে এমনি একটা জীবন-ব্যাপার চলেছে যে এদের কোনটিকেই এমন ক'রে বলা যায় না যে সেটি যেমনটি তেমনটি হ'য়েই স্থির হ'য়ে রয়েছে। "যেমনটি" এ কথার কোনও মানেই নেই; যে দেখে, যখন দেখে, যেমন করে দেখে, সেই অনুসারেই যেমনটি ভেসে বেড়াচ্ছে।

বিশ্বময় এমনি একটা একাত্ম প্রাণবন্ধনের যোগ রয়েছে যে, কাউকে ছেড়ে কারোই সীমানা নির্দ্দেশ করা চলে না। বিজ্ঞান আজ এমন কথাও বলে,—যে একগজ লাঠিখানাও সকল সময় একগজ থাকে না। লাঠিখানা স্থির আছে, কি জোরে চল্‌ছে, কে তাকে কোনখান থেকে কি ভাবে দেখ্‌ছে তার উপর লাঠির পরিমাণ নির্ভর করে।

আমরা যে ঘরে ব'সে কথা বল্‌ছি এই কথার শব্দ যদি গ্রহান্তর থেকে শোনা যেত, তবে আমার বক্তৃতার প্রথম ভাগ যে স্থানে উচ্চারিত হয়েছে তার মধ্যভাগ সেইস্থানেই উচ্চারিত হয়েছে ব'লে কেউ ভ্রম কর্‌ত না। অথচ এইখানে ব'সে এমন অসম্ভব কল্পনা কর্‌লে লোকে তাকে পাগল না বলে ছাড়ে না। এম্‌নি ক'রে দেখা যায় যে জানার সঙ্গে আর যা জানি তার সঙ্গে এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চলেছে যে এ দুটিই পরস্পরের মিলনে পরস্পরকে পরিবর্ত্তিত ক'রে নূতন থেকে নূতনতর হ'য়ে চলেছে। আমাদের সুখ দুঃখ ও ভাললাগা মন্দলাগা, সুন্দর অসুন্দর, ভালবাসা ও মন্দবাসা, আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, আমাদের শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য, যা কিছু আমরা শ্রেয় এবং প্রেয় মনে করি, যা কিছু আমরা পাচ্ছি, পেয়েছি বা হারিয়েছি সবই যেন জীবনের ছন্দে "তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ" ক'রে নেচে চলেছে।

আমাদের জানা ব'লেও এমন কোন স্থির বিন্দু নেই বা আমরা ব'লেও এমন কোন স্থির বিন্দু নেই, যেখানে সমস্ত বিষয়গুলি এসে আশ্রয় নেয়। রূপে, গন্ধে, সত্যে, কল্পনায়, হাসি কান্নায়, যা সত্য, তা ক্রমশঃ আপনার রূপ অভিব্যক্ত কর্‌ছে। সে রূপ স্থির নয়, তা চঞ্চল। তাই এমন কিছু স্থির বস্তু নেই যা যথাস্থিতভাবে আমাদের জ্ঞানে এসে প্রতিফলিত হয়। যা দেখি, যা অনুভব করি, সে সমস্তই আমাদের অনুভবের সোণার কাঠির স্পর্শে পরিবর্ত্তিত হয় এবং আমাদের অনুভবের সোণার কাঠিটিও সর্ব্বদাই অষ্টধাতুতে

পরিণত হ'য়ে চলেছে। এই মতটিকে idealism বলে। বাঙ্গালায় আমি একে **পরিকল্পনাবিবর্ত্ত** বা **কল্পনাবিবর্ত্ত** বলতে চাই।

এই দুইটি মতের পাশ কাটিয়ে আর একটি দার্শনিক মতও কিছুদিন ধরে ইয়োরোপে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে উঠছে। সেটিকে আমি বল্‌ব **অর্থক্রিয়াকারিত্ববাদ** বা **ব্যবহারিত্ববাদ** (pragmatism)। এঁরা বলেন যে, সত্য আমরা তাকেই বলি যা আমরা কাজে খাটাতে পারি, বা সে অনুসারে আমরা আমাদের নানাবিধ ব্যবহার সম্পন্ন কর্ত্তে পারি। কোনও কাজ কর্ত্তে গেলে, যা না বিশ্বাস করলে আমাদের চলে না বা অসুবিধা হয়, সেইটাকেই সত্য বলে এঁরা মেনে নিতে চান। বিশ্বাস করাও এঁরা তাকেই বলেন যে অনুসারে আমরা কাজ করি। কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনে যে চাঁটগা যেতে চায় সে রেলওয়ে টাইম্ টেব্‌ল বিশ্বাস করে আমরা তখনই বল্‌ব যখন আমরা দেখ্‌ব যে ভোরে ৭টায় গাড়ী ধরবার জন্য তল্পিতল্পা বেঁধে সে যথাসময়ে শিয়ালদহের দিকে ছুট্ দিয়েছে।

আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনার আসরে বস্তুতান্ত্রিকতার দল থেকে এ মতেরও প্রভাব কম নয়। চর্‌কা ঘুরলে দেশের মঙ্গল হবে এটা যখন নিশ্চিত, তখন চর্‌কা ঘুরন সম্বন্ধে খণ্ড কি মহাকাব্য নিশ্চয়ই জ'মে উঠ্‌তে পারে, সে জন্য নবোদ্গতপক্ষ কবিদের এই বিষয়েই কাব্য লেখা উচিত। এ সম্বন্ধে দুচারখানা কাব্য বেরিয়েছে এ কথাও আমি শুনেছি। ঋতু সম্বন্ধে বৃথা রসোদ্রেক করবার চেষ্টার চেয়ে যদি আমি লিখি—চর্‌কা ঘুমা ঘুমাকে চৌষট্ হাজার বাচা

বাচাকে স্বরাজ লেঙ্গে, এটার কাব্যরস সম্বন্ধে কারুর সন্দেহ হওয়া উচিত নয়। কারণ, এতে এক ঢিলেই তিনটি পাখী মারা গেছে।

প্রথমতঃ, এটা হিন্দীতে লেখা, তার প্রথম ফল এটা সকলেই বুঝবে; দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রীর চৌষট্টী হাজার টাকা বাঁচান গেল; তৃতীয়তঃ, এতে চরকা ঘোরানো গেল। এতগুণ সত্ত্বেও কবিতাটির চতুর্থ চরণের অভাব মার্জ্জনীয় নহে। আমাদের দেশে pragmatic বিষয়ের অভাব নাই, যথা ধাঙ্গড়বিদ্রোহ, কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া-নিবারণ, বন্যানিবারণ, দুর্ভিক্ষনিবারণ ইত্যাদি।

আজকালকার বাঙ্গালা সাহিত্যে যাঁরা realist বা **যথাভূতবাদী** তাঁরা মনে করেন যে যে বস্তুটি যেমন ক'রে আছে তাকে ঠিক সেই রকম ক'রে চোখের সাম্‌নে ধ'রে দেওয়াই সাহিত্যের কাজ। সমাজে আবর্জ্জনা বা পাঁক, পাপ বা মলিনতা, দুর্দ্দাম সংযমহীন ইন্দ্রিয়লোলুপতা এ সব জিনিষই ত রয়েছে। পূর্ব্বতন কবিরা এগুলিকে কাব্যের বিষয় করেন নি, কিন্তু না কর্‌বার ত কোন হেতু নেই, যেটি যেমন ক'রে আছে সেটি ত তেমন ক'রেই সত্যি। জঘন্যতা বা নিন্দনীয়তা ত মানুষের মনে, বস্তুর মধ্যে ত কোন নিন্দাপ্রশংসা নেই। প্রাচীনেরা যদি জীর্ণ সংস্কারবশে কতকগুলি সত্যকে হেয় ও বর্জ্জনীয় মনে করেন, তাই ব'লে সেগুলি হেয় বা বর্জ্জনীয় হ'তে পারে না। এঁরা **যথাস্থিত-বাদী**, সেই জন্যেই এঁরা বিশ্বাস করেন যে যেটি যে ভাবে আছে সেই ভাবেই সেটি সত্য এবং কাব্যের বিষয় হবার যোগ্য। এঁদের মন্ত্র হচ্ছে এই যে স্বভাবে সুরুচি কুরুচি নেই, সুনীতি দুর্নীতি নেই, পাপপুণ্য

নেই। এঁরা চান না যে কোন প্রাচীন সংস্কারের আদর্শের দ্বারা স্বভাবে যা রয়েছে তাকে ওলট্ পালট্ ক'রে দিয়ে পুরোণো ঢঙে গ'ড়ে তুলবেন, কারণ মনের কাজ শুধু যা আছে তাই দেখা, কাব্যেরও কাজ যা আছে তাই চিত্রিত করা। ব্যবহারবাদীরা হয়ত বলেন যে কাব্য জিনিষটা কল্পনায় না রেখে সত্যকার কাজে লাগানো উচিত। কাব্যরসের দ্বারা যখন লোকের মন অভিষিক্ত হয়, তখন সেই মনকে এমন করেই নরম করে দেওয়া উচিত যাতে অনায়াসে সুতো কাটতে বা কাপড় বুনতে লোকের প্রবৃত্তি হয়; অথবা ধাঙ্গড়দের দুঃখ দূর কর্ত্তে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

যথাস্থিতবাদীদের গোড়াকার বনেদে এই একটা প্রকাণ্ড ছিদ্র আছে যে যেমনটি যা আছে, সেটি তার পূর্ব্বাপরকে নিয়ে এমন ভাবেই আছে, যে সেখান থেকে তাকে ছিন্ন ক'রে কাব্যে চিত্রিত করবার জন্য মনের রঙে রঙিয়ে নিতে গেলেই যেমনটি আছে তেমনটি চিত্রিত করা সম্ভব হয় না।

আর একটি ছিদ্র এই যে রস জিনিষটি মনের বা হৃদয়ের অনুভবের বস্তু। অথচ হর্ষ, শোক, ভয়, দৈন্য, দুঃখ প্রভৃতি যা কিছু লৌকিক জীবনে অনুভব করি এবং যাকে ইংরেজীতে বলা যায় emotion সেটা কাব্যরস নয়।

কাব্যরসটা এইভাবে অলৌকিক যে emotion গুলি যেরূপ বহুল পরিমাণে ইন্দ্রিয়ভোগ্য শরীরভোগ্য ও স্বার্থজড়িত, কাব্যরস তা নয়। কাব্যের শোকরসে লোকে কাঁদে বটে, কিন্তু সে শোকরসে লৌকিক

শোকের দুঃসহতা নেই, কাজেই বাহ্যতঃ লৌকিক রসের সহিত কাব্যরসের একটা আপাতসাদৃশ্য আছে, এরূপ মনে হ'লেও, ইহা লৌকিক রস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সুরভি যেমন তৃণশস্প আহরণ ক'রে পরিপাক ক'রে সমস্ত তৃণশস্পকে ক্ষীরধারায় পরিণত করে, কবিও তেমনি তাঁর সুনিপুণ অনুভবের চমৎকারিত্বের দ্বারা লৌকিক রসকে কাব্যরসরূপে সৃষ্টি করেন। যতই থিওরির জঞ্জাল থাক্ না কেন, একথার নড়চড় হবার যো নেই যে রসসৃষ্টি না হ'লে কিছুতেই কাব্য হয় না। এই রসসৃষ্টি জিনিষটা কিছুতেই যথাস্থিতের চিত্রণে সম্ভব হয় না, কারণ প্রাণের অনুভবের অন্তরালোড়নের পরিপাকেই এর সৃষ্টি। যেমনটি আছে, কাব্যরসে কখনই ঠিক তেমনটি পাওয়া যায় না।

যথাস্থিতবাদীরা যতই কৃতী হউন, যদি তাঁরা কাব্যরসের সৃষ্টি করেন, তবে কিছুতেই তাঁরা যথাস্থিতবস্তুকে চিত্রিত কর্‌তে পারবেন না। দৈহিক ও প্রাকৃতিক আলম্বন উদ্দীপনা ছাড়া রসসৃষ্টি সম্ভব নয়, কিন্তু তাই ব'লে যে emotionটি শুধু রক্ত মাংসেই প'ড়ে থাকে, রক্তমাংসকে অতিক্রম ক'রে প্রেমের অলৌকিকতাকে স্পর্শ কর্‌তে পারে না, তাকে যথার্থ কাব্যরস বলা চলে না।

সেইজন্য আমার মনে হয় যে নিছক সর্ব্বাঙ্গীণ realismএর দ্বারা কাব্যরসের সৃষ্টি হতে পারে না, কিন্তু তার এ অর্থ নয় যে কাব্যে realism থাকা সম্ভব নয়। যে কাব্যে প্রধানতঃ যথাস্থিত স্বভাববস্তুকে স্থান দেওয়া হয়, স্বভাবকে যতদূর সম্ভব অবিকৃত রেখে সেই স্বভাবের

অনুভূতির মধ্য দিয়ে যে অলৌকিক আনন্দরসের চমৎকারিত্ব কবির প্রাণকে স্পর্শ করে, স্বভাবের সমস্ত উপকরণসম্ভারের সহিত সেই স্পর্শটুকু কবি যখন বিতরণ করেন, তখন সেইখানেই আমরা কাব্যের realismএর পরিচয় পাই। অবশ্য চুলচেরা বিচার করতে গেলে কাব্যে realism সম্ভবই নয়, কারণ স্বভাবানুগত যে বস্তুরই বর্ণনা কবি করুন না কেন, তার অলৌকিক রসানুভূতির স্পর্শটুকু না দিতে পারলে কিছুতেই কাব্যসৃষ্টি হয় না। অপর পক্ষে realismএর দিক থেকে একথা বলা চলে যে উপকরণসম্ভারে প্রাচুর্য্য না থাকলে শূন্যের গলায় দড়ি দিয়ে শুধু পরিকল্পনার বলে কাব্য সৃষ্টি চলে না।

প্রাচীনকাল হ'তে আমাদের দেশের কাব্য যে ভাবে গ'ড়ে উঠেছে, তা দেখলে মনে হয় যে যথাস্থিত স্বভাববর্ণনার প্রাধান্যেই আমাদের দেশের কাব্যের আরম্ভ। প্রকৃতির দিকে যখন আদি কবি বাল্মীকি চেয়ে দেখতেন, তখন প্রকৃতির নিছক আপন রূপটি বিশেষভাবে তাঁকে আকৃষ্ট করত। প্রকৃতির ব্যাপারের সহিত মানুষের ব্যাপারের যে একটা সাদৃশ্য আছে, বা প্রকৃতির ব্যাপারগুলি মানুষের জীবনকে কি ভাবে পরিবর্ত্তিত করে, বা কি ভাবে মানুষের ভোগে বা উপকারে আসে, বা মানুষকে কি ভাবে প্রতিহত বা বিপর্য্যস্ত করে তার ছায়া বাল্মীকির কবিতায় যে নাই তা নয়, কিন্তু ক্ষীণ। কাব্যে যথাস্থিত দৃষ্টির ইহাই প্রথম স্তর। কিন্তু বাল্মীকির পরবর্ত্তী অনেক কবির মধ্যেই দেখা যায় যে তাঁরা ক্রমশঃই প্রকৃতির ব্যাপারের দ্বারা মানুষ কি ভাবে সুখ দুঃখ ভোগ করে এবং তাদের নানাবিধ দৈনন্দিন

ব্যাপার প্রকৃতির লীলাবৈষম্যের দ্বারা কিরূপে প্রসারিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়, এই দিক হ'তেই বিশেষ ক'রে ফুটাইবার চেষ্টা করেছিলেন। কালিদাসের ঋতুসংহারে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাই দ্বিতীয় স্তর।

প্রকৃতিকে মানুষ যখন তার ব্যবহারের উপযোগিতার দিক হতে দেখে, তখন তাকে ব্যবহারিক অর্থক্রিয়ামূলক বা pragmatic বলা যায়। পূর্ব্বেই বলেছি যে ব্যবহারিকতা বা pragmatismএর উপর নির্ভর করলে কাব্য জমে না, এবং সেই হিসাবে এই শ্রেণীর অনেকের কাব্য জমেও নি। কিন্তু অনেকেই আবার এই pragmatismএর ছায়াকে এত ক্ষীণ করেছেন যে তার মধ্য দিয়ে কাব্যরসের আনন্দটি কুণ্ঠিত হয় নি।

তৃতীয় স্তরে দেখা যায় যে কেহ বা pragmatismএর ব্যবহারিকতার অংশটি ছেড়ে দিয়ে প্রকৃতি থেকে মানুষচরিত্রের নানা লীলাবৈষম্যে প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন। চতুর্থ স্তরে দেখা যায় যে কবি প্রকৃতির আনন্দে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে একেবারে অন্তর্লোকের দেদীপ্যমান শুভ্রজ্যোতি পুরুষের স্পর্শটুকু প্রকৃতির রসে রসাল ক'রে কাব্যের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। এইখানেই কাব্যের পরিকল্পনাবিবর্ত্ত বা idealism-এর চরম বিকাশ। প্রকৃতির উপকরণ-সম্ভারমূলক যথাস্থিতবৃত্তিক realism হ'তে মানুষের চিত্ত এইরূপে ক্রমশঃ ধাপে ধাপে কল্পনা-বিবর্ত্তের বিমল স্বর্গে আরোহণ করে। ভারতবর্ষীয় বর্ষাকবিতা থেকে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত ক'রে কাব্যে realism হ'তে idealismএ উঠ্‌বার ক্রমপদ্ধতি অতি সঙ্ক্ষেপে বিবৃত করতে চেষ্টা করব।

সুগ্রীব রামচন্দ্রের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে রাবণের নিকট হইতে সীতাকে তিনি উদ্ধার করিয়া দিবেন কিন্তু ইতিমধ্যে বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে, একালে যুদ্ধযাত্রা অসম্ভব, তাই রামচন্দ্র বর্ষাবসানের প্রতীক্ষা করিতেছেন। সীতাকে ছাড়িয়া রাম রহিয়াছেন, একদিকে এই বিরহ; অপরদিকে হৃতদার, হৃতরাজ্য রামচন্দ্রের বর্ষাকালের প্রতিকূলতায় যুদ্ধযাত্রার জন্য আকুলতা।

"অহন্তু হৃতদারশ্চ রাজ্যাচ্চ মহতশ্চ্যুতঃ।
নদীকূলমিব ক্লিন্নমবসীদামি লক্ষ্মণ ॥
শোকশ্চ মম বিস্তীর্ণো বর্ষাশ্চ ভৃশদুর্গমাঃ।
রাবণশ্চ মহাঙ্খক্রূরপারঃ প্রতিভাতি মে ॥
অযাত্রাং চৈব দৃষ্ট্বেমাং মার্গাংশ্চ ভৃশদুর্গমান্।
প্রণতে চৈব সুগ্রীবে ন ময়া কিঞ্চিদীরিতম্ ॥"

রামচন্দ্রের এমন বিরহ, এমন শোক, এমন বিপদ, অথচ এই বর্ষাকালে দীর্ঘদিনের পর সুগ্রীব তাহার স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ করিতেছে।

"অপি চাপি পরিক্লিষ্টং চিরাদ্দারৈঃ সমাগতম্।
আত্মকার্য্যগরীয়স্ত্বাদ্ বক্তুং নেচ্ছামি বানরম্ ॥"

চারিদিকের এই সমস্ত ঘটনায় বেশ একটি pragmatic atmosphere দেয়। পরবর্ত্তী কবিরা হইলে স্ত্রী কাছে থাকিলে, কি কি উপভোগ করা যাইত, বর্ষাকালে স্ত্রী কাছে না থাকিলে, তাহার কি

দুঃখ এ সম্বন্ধে অনেক কান্না কাঁদিতেন। কিন্তু বাল্মীকির কবিতায় এই subjective reference বা pragamatic attitude অত্যন্ত ক্ষীণ। একবার মাত্র নীলমেঘের কোলে বিদ্যুৎ দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে সীতাহরণের সময় সীতা রাবণের কোলে এমনি করিয়াই বুঝি ছটফট করিয়াছিলেন ঃ—

"নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎ স্ফুরন্তী প্রতিভাতি মে।
স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে বৈদেহীব তপস্বিনী ॥"

মেঘের জলবর্ষণ দেখিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল যে সীতাও বুঝি এমনি করিয়াই বাষ্প বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন ঃ—

"এষা ধর্ম্মপরিক্লিষ্টা নববারিপরিপ্লুতা।
সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি ॥"

কিন্তু বৃষ্টি দেখিয়া সীতার কথা এইভাবে স্মরণ হওয়াতে কোনরূপ ব্যবহারিকতার ছায়া নাই। কেবলমাত্র নিজের দিক্ দিয়া (subjective referenceএ) একটু স্মৃতি মাত্র। এই স্মৃতি যে শুধু সীতা সম্বন্ধেই ঘটিয়াছিল তাহা নয়, রামচন্দ্রের পূর্ব্বজীবনের অন্যান্য ঘটনার সহিতও বর্ষার তুলনা করিয়া এইরূপ স্মৃতির বর্ণনার উদাহরণ পাওয়া যায়। একস্থানে রাম বলিতেছেন যে পর্ব্বতগুলি যেন মেঘের কৃষ্ণ অজিন পরিয়া ও বৃষ্টিধারার উপবীত গলায় দিয়া ব্রহ্মচারীদের ন্যায় গুহা প্রতিধ্বনিত করিয়া বেদপাঠ করিতেছেন। আবার অন্যত্র তিনি বলিতেছেন যে আকাশের গায়ে কে যেন বিদ্যুতের সোণার চাবুক

মারিতেছে, আর তারি আঘাতে আকাশ বেদনাতুর হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে :—

"মেঘকৃষ্ণাজিনধরা ধারাযজ্ঞোপবীতিনঃ।
মারুতপূরিতগুহা প্রাধীতা ইব পর্ব্বতাঃ॥
কশাভিরিব হৈমীভির্বিদ্যুদ্ভিরভিতাড়িতম্।
অন্তস্তনিতনির্ঘোষং সবেদনমিবাম্বরম্॥"

কিন্তু এ ছাড়া সাধারণতঃ তাঁহার গোটা বর্ষাবর্ণনাটাই নিছক বর্ষাকালের প্রকৃতির বর্ণনা, ফলফুলের বর্ণনা, পশুপক্ষীর বর্ণনা। আর গরম নাই, ধূলা নাই, বাতাস সিক্ত, পথঘাটে কাদা, গাড়ী চালাইবার উপায় নাই, আকাশের কোনও স্থল পরিষ্কার, কোনও স্থল মলিন, চারিদিকে ছিন্ন মেঘ; কখনও বা আকাশ দেখিতে শান্ত সমুদ্রের ন্যায় :—

"ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশং নভঃপ্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্ব্বতসন্নিরুদ্ধং রূপং যথা শান্তমহার্ণবস্য॥"

গৈরিক পাহাড়ের রঙে অরুণিত জলধারা পাহাড়ের গা বাহিয়া পড়িতেছে আর তাহার সঙ্গে শাল আর কদম ফুল ভাসিয়া আসিতেছে। চারিদিকে তরুণ ঘাস উঠিয়াছে। নদী, পুকুর, দীঘি, পৃথিবী সমস্ত জলে ভাসিয়া যাইতেছে। জোরে বাতাস বহিতেছে, আকাশ ঘনান্ধকারে অবলিপ্ত, বড় বড় পাহাড়ের মতন মেঘগুলি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, পাহাড়ের শিখরগুলি জলবিধৌত হইয়া আরও উচ্চতর

দেখাইতেছে। নীলমেঘের গায়ে নীলমেঘ লাগিয়া রহিয়াছে, বড় বড় জামের গাছে পাকা পাকা কাল জামগুলি ভ্রমরের মত ঝুলিয়া রহিয়াছে, কোনও কোনও স্থানে ঝড়ে চ্যুতবৃন্ত আমগুলি গাছের তলায় লুটাইতেছে। সমস্তদিন বর্ষণের পর বৈকালের দিকে মেঘগুলি ভার হইয়া রহিয়াছে। হস্তীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে বলাকার মালা গলায় দিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে বিশ্রাম করিয়া মেঘগুলি আকাশ দিয়া তাহাদের দীর্ঘ অভিযান আরম্ভ করিয়াছে।

"বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ শৈলেন্দ্রকূটাকৃতিসংনিকাশা।
গর্জ্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদা মত্তা গজেন্দ্রা ইব সংযুগস্থাঃ॥
সমুদ্বহন্তঃ সলিলাতিভারং বলাকিনো বারিধরা নদন্তঃ।
মহৎসু শৃঙ্গেষু মহীধরাণাং বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রয়ান্তি॥
মেঘাভিকামা পরিসংপতন্তী সংমোদিতা ভাতি বলাকপঙ্ক্তিঃ।
বাতাবধূতা বরপৌণ্ডরীকী লম্বেব মালারুচিরাম্বরস্থ॥"

আবার বনে বনে কদম্বফুল ফুটিয়াছে, পৃথিবী শস্যপূর্ণ হইয়াছে এবং ময়ূরেরা কেকাধ্বনির সহিত নৃত্য করিতেছে। কেতকী ফুলের গন্ধে মত্ত হইয়া হাতীগুলি মদমত্ত হইয়া উঠিয়াছে, আবার জলধারার আঘাতে মধুমাতাল ভ্রমরের মত্ততা দূর হইতেছে; ক্রীড়ামত্ত সুরাঙ্গনাদের মুক্তার হার ছিঁড়িয়া গিয়া বৃষ্টিধারায় পতিত হইতেছে। পাতার উপর মুক্তার মতন টলটলে জল পাখীরা পান করিতেছে, মেঘের মৃদঙ্গনিনাদের সহিত ময়ূরের কেকাধ্বনি ও ভেকের কণ্ঠতাল যুক্ত হইয়া

সমস্ত বনস্থলীকে যেন সঙ্গীতের সঙ্গত করিয়া তুলিয়াছে, আর সেই সঙ্গতে বিচিত্র বর্ণালঙ্কৃত ময়ূরীরা নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। আকাশে তারাও দেখা যায় না, সূর্য্যও দেখা যায় না, খালি অবিশ্রান্ত জলধারা বেগে পতিত হইতেছে।

> "ঘনোপগূঢ়ং গগনং ন তারা ন ভাস্করো দর্শনমভ্যুপৈতি।
> নবৈর্জলৌঘৈর্ধরণী বিতৃপ্তা তমোবলিপ্তা ন দিশঃ প্রকাশাঃ॥
> মত্তা গজেন্দ্রা মুদিতা গবেন্দ্রা বনেষু বিক্রান্ততরা মৃগেন্দ্রা।
> রম্যা নগেন্দ্রা নিভৃতা নরেন্দ্রাঃ প্রক্রীড়িতো বারিধরৈঃ সুরেন্দ্রঃ॥
> বহন্তি বর্ষন্তি নদন্তি ভান্তি ধ্যায়ন্তি নৃত্যন্তি সমাশ্বসন্তি।
> নদ্যো ঘনা মত্তগজা বনান্তাঃ প্রিয়াবিহীনাঃ শিখিনঃ প্লবঙ্গাঃ॥"

এমনি ক'রে আমরা দেখতে পাই যে আদি কবি বাল্মীকির রচনায় যথাস্থিতবস্তুবিষয়ক realismএরই প্রাধান্য অথচ এই realismএর মধ্য দিয়ে বর্ষার সৌন্দর্য্য তাঁর প্রাণে যে হর্ষস্পর্শের ঝঙ্কার তুলেছে, তাঁর কাব্যের প্রতি অক্ষরে তা ফুটে উঠেছে।

আদি কবিগুরুর শিষ্যানুশিষ্য ভবভূতিও মালতীমাধবের ৯ম অঙ্কে বর্ষা বর্ণনায় কবিগুরুকে অনুবর্ত্তন ক'রে এই realism-এর পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন:—কুঞ্জঘেরা সরোবরের ধারে বেতের ফুল ফুটেছে, জুঁইএর বনের গন্ধে বাতাস হাই তুলছে, কুটজ ফুল পাহাড়ের গায়ে গায়ে হেসে ঝ'রে পড়ছে আর মেঘেরা ময়ূরদের নাচিয়ে তুল্‌ছে। পাহাড়ের গা দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে আর তার মধ্যে, তার পাশে

ফলভারপরিণামশ্যাম জম্বুবন, আর তার গায়ে নীল রঙের নূতন মেঘ আশ্রয় করে রয়েছে। সাঁসাঁ শব্দে ঝড়ে অর্জ্জুন আর শালের ফুল উড়িয়ে নিয়ে চলেছে, ইন্দ্রনীলের মতন চিকণ কাল মেঘ শ্রেণী বেঁধে আকাশে দুলছে, নূতন জলধারার ভেজা গন্ধে পুরাতন গ্রীষ্ম কালের দিনগুলি সরে গিয়ে নূতন শোভা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়েছে।

ভবভূতির বর্ণনায় বিষয়ের তত জোর না থাকলেও শব্দ ও ছন্দের ঝঙ্কার ঠিক বর্ষাকালের মতনই গম্ভীর ঃ—

"বানীরপ্রসবৈর্নিকুঞ্জসরিতামাসক্তবাসং পয়ঃ।
পর্য্যন্তেষু চ যূথিকাসুমনসামুজ্জৃম্ভিতং জালকৈঃ॥
উন্মীলৎকূটজ-প্রহাসিষু গিরেরালম্ব্য সানূনিতঃ।
প্রাগ্‌ভারেষু শিখণ্ডিতাণ্ডববিধৌ মেঘৈর্বিতানায্যতে॥
জৃম্ভাজর্জরডম্বরঘনশ্রীমৎকদম্বদ্রুমাঃ।
শৈলাভোগভুবো ভবন্তি ককুভঃ কাদম্বিনীশ্যামলাঃ॥
উন্মৎকন্দলকান্তকেতুকভৃতঃ কচ্ছা সরিচ্ছ্রোতসাম্
আবির্গন্ধশিলীন্ধ্রলোধ্রকুসুমস্মেরা বনানাং ততিঃ॥"

অন্যান্য অনেক কবিও এঁদের পথানুবর্ত্তী হ'য়ে এই রকম যথাবদ্বস্তু-বর্ণনার দিক দিয়ে বর্ষাঋতুকে সম্ভোগ করবার চেষ্টা করেছেন। কবি যোগেশ্বর বল্‌ছেন, ধারাবর্ষার পর অতি ধীরে বায়ু বইছে, আকাশ মেঘে ঢাকা, চন্দ্রতারা ঘুমিয়ে পড়েছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কে ওঠায় এদিকে একটু আধটু দেখা যাচ্ছে, সমস্ত প্রকৃতি এমন শান্ত যে বেঙের

ডাক অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়্ছে আর কদম্ব-রেণু-ধোয়া বাতাসের গন্ধ চারিদিক ব্যাপ্ত কর্ছে, বিরহীরা কেমন ক'রে এমন রাতগুলি কাটায়—

"আসারান্তমুহুপ্রবৃত্তমরুতো মেঘোপলিপ্তাম্বরাঃ
বিদ্যুৎপাতমুহূর্ত্তদৃষ্টককুভঃ সুপ্তেন্দুতারাগ্রহাঃ।
ধারাক্লিন্নকদম্বসম্ভৃতসুরামোদোদ্বহাঃ প্রোষিতৈঃ
নিঃসম্পাতবিসারিদর্দুররবা নীতাঃ কথং রাত্রয়ঃ॥"

বাতোক কবি বল্ছেন যে এমন জোরে বর্ষা চলেছে যে মদমত্ত হস্তীর গর্জনের মতন মেঘগর্জনের দ্বারা সকলের মন একেবারে নিস্তেজ হ'য়ে পড়্ছে ও দিগ্‌বধূদের কোলে সূর্য্য চন্দ্রের দুই চোখ বুজে আকাশ পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ছে।

"এতস্মিন্মদজর্জ্জরৈরুপচিতে কম্বুরবাড়ম্বরৈঃ।
স্তৈমিত্যং মনসো দিশত্যনিভৃতং ধারারবে মূর্চ্ছতি॥
উৎসঙ্গে ককুভো বিধায় রসিতৈরম্ভোমুচাং ঘোরয়ন্
মন্যে মুদ্রিতচন্দ্রসূর্য্যনয়নং ব্যোমাপি নিদ্রায়তে॥"

আর একজন কবি বল্ছেন যে কেতকী ফুলের ধূলি গায়ে মেখে বলাকাবলির শাদা কাপড়ে ঢাকা মড়া মাথায় নিয়ে নীল মেঘের জটায় জটিল হয়ে বিদ্যুতের ধনু খড়্গ ধারণ ক'রে বিরহিনীদের বধ করিবার জন্য এ কোন কাপালিক এসে উপস্থিত হ'ল।

অভিনন্দ কবি বল্ছেন যে ভীষণ ঘনান্ধকার বিদ্যুতের দ্বারা মধ্যে

মধ্যে ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে; কাছের গাছটিকে পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না, খালি জোনাকি দ্বারা অনুমান করে নিতে পারা যায়; ঝিঁ ঝিঁ পোকার গানে রাত্রি ঝন্ ঝন্ করে উঠ্ছে।

"বিদ্যুদ্দীধিতিভেদভীষণতমঃ স্তোমান্তরাঃ সন্তত
শ্যামাম্ভোধররোধসংকটবিয়দ্বিপ্রোষিতজ্যোতিষঃ।
খদ্যোতানুমিতোপকণ্ঠতরবঃ পুষ্ণন্তি গম্ভীরতাম্
আসারোদকমত্তকীটপটলীক্বাণোত্তরা রাত্রয়ঃ॥"

কিন্তু ভারতবর্ষীয় চিত্ত কোমলস্পর্শী, তাই এদেশের বর্ষা বর্ণনার মধ্যে যে realism দেখতে পাওয়া যায় তা প্রায়শঃই বর্ষার প্রসন্নতা স্তিমিততা বা সৌন্দর্য্যকেই বিশেষভাবে বরণ ক'রে নিয়েছে। উদ্দাম ঝড় বর্ষার যে ভীষণ প্রচণ্ডতার বর্ণনা আমরা মধ্যে মধ্যে ইউরোপীয় কবিতায় দেখতে পাই, ভারতবর্ষীয় কবিতায় সেরূপ প্রচণ্ডতার Realism প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না বল্লেই হয়। যেমন Burnsএর Brigs of Ayr :—

'When heavy, dark, continued, a'-day rains
Wi' deep'ning deluges o'erflow the plains;
When from the hills where springs the brawling Coil,
Or stately Lugar's mossy fountains boil,...
Arous'd by blust'rning winds an' spotting thowes,
In many a torrent down the snaw-broo rowes;
While crashing ice, borne on the roaring spate,

Sweeps dams, an' mills, an' brigs, a' to the gate ;
And, from Glenbuck down to the Ratton-key,
Auld Ayr is just one lengthened tumbling sea', etc.

অথবা যেমন Thomsonএর The Seasons কবিতায় :—

First, joyless rains obscure
Dry through the mingling skies with vapour foul,
Dash on the mountain's brow, and shake the woods
That grumbling wave below. The unsightly playing
Lies a brown deluge,—as the low-bent clouds
Pour flood on flood, yet unexhausted still
Combine, and deepening into night shut up
The day's fair face...
At last the roused up river pours along
Resistless, roaring dreadful down it comes
From the rude mountain and the mossy wild,
Tumbling through rocks abrupt and sounding far ;
Then o'er the sanded valley floating spreads,
Calm, sluggish, silent,...
Then issues forth the storm with burst
And hurls the whole precipitated air
Down in torrent. On the passive main
Descends the ethereal force, and with strong gust
Turns from its bottom the discoloured deep.
Through the black night that sits immense around.

Lashed into foam, the fierce conflicting brine
Seems o'er a thousand raging waves to burn.
Meantime the mountain-billows, to the clouds
In dreadful tnmult swelled, surge above surge,
Burst into chaos with tremendous roar,
And anchored navies from their stations drive
Wild as the winds across the howling waste
Of mighty waters :

কালিদাসের বর্ষা কবিতার বৈচিত্র্য দুই এক কথায় সারবার নয়, অনায়াসেই কোন সুলেখেক তাঁর বর্ষা কবিতার উপর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থিকা রচনা করতে পারেন। কিন্তু আমাদের হাতে সময় নাই, তাই দুই একটি কথা বলা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই। কালিদাসের বর্ষা বর্ণনায় বাল্মীকির Realism-এর চেয়ে আমরা আরও অনেকখানি উঁচু ধাপে উঠে দাঁড়াই। একদিকে যেমন তিনি বর্ষা প্রকৃতির স্বভাব বর্ণনা করেছেন, বর্ষাতে প্রকৃতি যেমন সুন্দর হয় তা বর্ণনা করেছেন, তেমনি বর্ষাতে মানুষের চিত্তকে কেমন ক'রে নূতন নূতন রেশে প্রভাবিত ক'রে তোলে তাও তিনি বর্ণনা করেছেন।

শুধু তাই নয়, তাঁরি কাব্যে আমরা প্রথম দেখতে পাই যে বর্ষা ঋতু বা মেঘ শুধু ঋতু নয়, সে একটি ঋতু-পুরুষ। এই ঋতু-পুরুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা গভীর সৌহার্দ্দ্য ও প্রীতির বন্ধন আছে, তা কালিদাস মেঘদূতে খুব ভাল ক'রেই দেখিয়েছেন। রামগিরির যক্ষ বিরহাতুর হৃদয়ে দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী হ'য়ে কূটজ কুসুমে অর্ঘ্য রচনা করে,

সন্তপ্তের শরণ মেঘকে বন্ধুত্বে বরণ ক'রে তার বিরহের বার্ত্তা এই মর্ত্তলোক ছেড়ে সেই দূরের অলকাপুরীতে প্রেরণ করেছিল। মর্ত্তের যা বন্ধন তা কালিদাস কোন কাব্যেই অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু মর্ত্তের বন্ধন থেকে যে আমরা অমৃতে পৌঁছুতে পারি, মর্ত্ত থেকে আমাদের যে প্রেম শুরু হয়, তা যে অমৃত পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছয় একথা কালিদাস তাঁর অনেক কাব্যেই আমাদের বলেছেন।

বর্ষাকালে মানুষের মন পত্নীর সহিত মিলিত হবার জন্য আকুল হ'য়ে ওঠে, একথা কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অনেক কবিই বলেছেন, কিন্তু মানুষের প্রেম যে এমন অক্ষয়, এমন অমর যা জনক-তনয়াস্নানপুণ্যোদক রামগিরি হইতে নিত্য প্রেমের, নিত্য নবযৌবনের, নিত্য জ্যোৎস্নাময় অলকাপুরী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় এবং বর্ষা ঋতু যে ভাইয়ের মতন, দেবরের মতন ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার মিলন সঙ্ঘটন ক'রে দেয় এই idealismটি সকল ভাষায়, সকল যুগে নূতন।

শকুন্তলা ও কুমারসম্ভব কাব্যে সংযমের দ্বারা ভোগাতীত মিলনকে পাওয়া যায় এ কথা কালিদাস আমাদের বলেছেন। কিন্তু, প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির দৌত্যে, সখিত্বে, যে বিরহী বিরহিণীর মিলনাতুর হৃদয় অশরীর প্রেমে মিলিত হয়, এটিই মেঘদূতের শিক্ষা।

কালিদাসের অন্তর্বৃত্তির পরিকল্পনাবিবর্ত্তে তিনি যে বর্ষাঋতুকে শুধু প্রাণময় ক'রে দেখেছিলেন, তা নয়, মিলনাতুর হৃদয়ের আকুল ক্রন্দন যে এই ঋতুপুরুষকে স্নেহসিক্ত ক'রে তুল্‌তে পারে এবং এই ঋতুপুরুষের দ্বারা আমরা যে আমাদের বিরহের গানকে আমাদের প্রিয়জনের নিকট

পাঠাতে পারি এই কথাটি কালিদাস সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যান, তখন তরুলতারা স্নেহ বিগলিত হ'য়ে তাকে উপহার দিয়েছিল, সেইখান থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে প্রকৃতিচিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের একটি সহানুভূতি আছে। সে সহানুভূতি যে সত্যই কত গভীর হ'তে পারে সে কথা আমরা মেঘদূতে বুঝতে পারি। প্রকৃতি মূক নিঃশব্দ তবু সে মানুষের দুঃখ বোঝে, মানুষের বন্ধু হয়ে বন্ধুকৃত্য সম্পাদন করে। তাই মেঘদূতের উপান্ত শ্লোকে কালিদাস বলছেন যে, হে মেঘ, তুমি নিঃশব্দ হ'য়ে চাতককে জল দাও, তাই নিঃশব্দ হ'য়ে আছ ব'লে আমার বন্ধুকার্য্য যে করবে না এমন কথা আমি মনে কর্ত্তে পারি না।

"কচ্চিৎ সৌম্য ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে
প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং কল্পয়ামি।
নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ
প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব॥"

অন্তিম শ্লোকে তিনি বলছেন যে হে মেঘ, বিদ্যুৎ পত্নীর সহিত তোমার কখনও যেন বিরহ না হয়। তুমি বন্ধুত্বের অনুরোধেই হ'ক, কৃপার অনুরোধেই হ'ক, বা আমাকে আর্ত্ত দেখেই হ'ক, তুমি আমার দৌত্য সম্পাদন ক'রে তারপর তোমার যথেচ্ছ দেশে গমন করতে পার। ঋতুপুরুষকে কালিদাস যে সম্পূর্ণ সজীব ও সচেতন ক'রে দেখেছিলেন, তা তাঁর মেঘদূতের প্রতি ছত্রে বোঝা যায়। এই ঋতুপুরুষ শুধু যে

মানুষের সুহৃদ্, বন্ধু ও সখা তা নয়, সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে এই ঋতুপুরুষের যে চেতন পুরুষের ন্যায় আনন্দ সম্ভোগের লীলা চলেছে, প্রকৃতির হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু রেখে তা কালিদাস প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর মেঘদূতকে পথ দেখাবার সময় তার দৌত্যযাত্রার পথে নানা মনোবিলোভন ব্যাপারের কথা বর্ণনা ক'রে মেঘকে উৎসুক ক'রে তুলেছিলেন। কালিদাসের কথা বলতে আরম্ভ করলে আর থামা যায় না, কিন্তু আজ আর বলা চলে না।

কালিদাসের মধ্যে যে উচ্চ অঙ্গের idealism দেখতে পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে সেরূপ idealism আর কোন কবির মধ্যেই তেমন ক'রে দেখা যায় না।

তুলসীদাস একজন বড় কবি, কিন্তু তিনি ছিলেন প্রধানত ভক্ত, তাই একদিকে যেমন তিনি প্রকৃতিকে যথাবৎ ভাবে বর্ণনা করতে ভাল বাসতেন, অপর দিকে তাঁর idealism ছিল এই ধরণের যে তিনি সর্ব্বদাই প্রকৃতি থেকে উপদেশ পাওয়ার চেষ্টা করতেন। যথাঃ—

ঘন ঘমণ্ড নভ গরজত ঘোরা। প্রিয়াহীন ডরপত মন মোরা॥
দামিনী দমকী রহী ঘন মাহী। খল কী প্রীতি যথা থির নাহি॥
বরষহি জলদ ভূমি নিয়রায়ে। যথা নবহিঁ বুধ বিদ্যা পায়ে॥
বুদ অঘাত সহৈ গিরি কৈসে। খলকে বচন সন্ত সহ জৈসে॥
ভূমি পরতভা ডাবর পানি। জিমি জীবহি মায়া লপুটনী॥

বিদ্যাপতির কবিতার মধ্যে বর্ষার realistic বর্ণনা বেশ সুন্দর দেখা যায়, যেমন ঃ—

গগনে অব ঘন মেঘ দারুণ সঘন দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন পবন খরতর বলগই॥

... ...

তরল জলধর বরিখে ঝরঝর গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলে কৈসনে পন্থ হেরই মোর॥

আবার

ঝরঝর বরিষ সঘন জলধার।
দশদিশ সবহুঁ তেহ আঁধিয়ার॥
এ সখি কিয়ে করব পরকার।
অব জনু বারএ হরি অভিসার॥
ঝলকই দামিনী দহন সমান।
ঝন্‌ঝন্ শবদ কুলিশ ঝনঝান্॥
ঘর মাহ রহত রহই ন পার।
কি করব ই সব বিঘিনি বিথার॥

আবার

রজনী কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম কুলিশ পড়য়ে দুরবার।
গরজ তরজ মন রোষে বরিষ ঘন সংশয় পড় অভিসার॥

আবার

কাজরে সাজলি রাতি।
ঘন ই বরিষয়ে জলধর পাঁতি॥
বরিষ পয়োধর ধার।
দূরপথ গমন কঠিন অভিসার॥
যমুনা ভয়াউনি নীরে।
আরতি ধসতি পাউতি নহি তীরে॥
বিজুরি তরঙ্গে ডরাই।
তোঁ ভল কর জোঁ পলটি ঘর যাই॥
ঝাঁখতি দেব বনমালী।
এহি নিশি কোনে পরি আউতি গোয়ালী॥

আবার

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর ইত্যাদি।

গোবিন্দদাসের বর্ষা বর্ণনাও অনেকটা বিদ্যাপতিরই মতন; যথা :—

ঝর ঝর জলধর ধার। ঝঞ্ঝা পবন বিথার॥
ঝলকত দামিনী মালা। ঝামরি ভৈ গেল বালা॥
ঝাঁপি রহত দুঁহু কাণ। ঝন ঝন বজর নিশান॥
ঝিঞ্চিরি ঝঙ্করু রাতি। ঝঙ্ক সহনে নাহি যাতি॥ ইত্যাদি

এই সমস্ত বর্ণনার মধ্যে বর্ষাঋতুর বর্ষণের দিকটা সুন্দর শব্দযোগে

সুন্দর ক'রে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এই সমস্ত বর্ষার বর্ষণটি কৃষ্ণ-রাধার প্রেমের আলম্বন উদ্দীপন রূপেই ব্যবহার হয়েছে। বর্ষা ঋতুতে স্ত্রী পুরুষ মিলনের জন্য সমুৎসুক হয়, ঘনান্ধকারে যখন অভিসারিকারা নায়কের নিকট গমন করে তখন মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকে তারা আপন পথ দেখে নেয়। এ সমস্ত সংস্কৃত কাব্যের অতি প্রাচীন মামুলী বর্ণনা। সেই হিসাব থেকে এই বর্ষা ঋতুতে কৃষ্ণের জন্য রাধার যে উৎকণ্ঠা বর্ণনা করা হয়েছে, বা রাধার অভিসারের পথে যে সমস্ত বিঘ্নের বর্ণনা করা হয়েছে, সে অংশে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস প্রভৃতিতে কোন নূতনত্ব নাই। কিন্তু বিদ্যাপতি প্রভৃতি এই মিলনোৎকণ্ঠাকে এমন চমৎকার আবেগের সহিত চিত্রিত করেছেন যে শব্দঝঙ্কারের সহযোগে নূতন না হ'লেও তা অতি নূতনভাবে হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং দ্রবীভূত করে।

মধ্যযুগের বাঙ্গালাদেশের ঘরোয়া কবিতায় অনেক সময়ে বর্ষাঋতুর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা একদিকে যেমন অতি সুন্দরভাবে realistic অপর দিকে তেমনি স্ত্রী-পুরুষের মিলানাতুর চিত্তের উৎকণ্ঠায় ভরপূর। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৈমনসিংহ গীতিকার কঙ্ক ও লীলার উপাখ্যান হ'তে একটু উদ্ধৃত ক'রে দেখান যেতে পারে।

আষাঢ় মাসের কালে আশা ছিল মনে।
অবশ্য আসিবে বঁধু লীলা সম্ভাষণে॥
নূতন বরষা আসে লইয়া নব আশা।
মিটিবে অভাগী লীলার মনের যত আশা॥

হাতেতে সোনার ঝাড়ি বর্ষা নামি আসে।
নবীন বরষা জলে বসুমাতা ভাসে ॥
সঞ্জীবন সুধারাশি কে দিল ঢালিয়া।
মরা ছিল তরুলতা উঠিল বাঁচিয়া ॥
শুক্‌না নদী ভরে উঠে কূলে কূলে পানি।
বাণিজ্য করিতে ছুটে সাধুর তরণী ॥

আবার

কাল মেঘে সাজ ক'রে ঢাকিয়া গগন।
ময়ূর ময়ূরী নাচে ধরিয়া পেখম ॥
কদম্বের ফুল ফুটে বর্ষার বাহার।
লতায় পাতায় শোভে হীরামণ হার ॥
মেঘ ডাকে গুরু গুরু চমকে চপলা।
ঘরের কোণে লুকাইয়া কান্দে অভাগিনী লীলা
শ্রাবণ আসিল মাথে জলের পসরা।
পাথর ভাসাইয়া বহে শাউনিয়া ধারা ॥
জলেতে কমল ফুটে আর নদী কূল।
গন্ধে আমোদিত করি ফুটে কেওয়া ফুল ॥
দিন রাতি ভেদ নাই মেঘ বর্ষে পানি।
কূল ছাপাইয়া জলে ডুবায় ছাউনি ॥
খাউরি বিউনা করে যত ডুমের নারী।
কত দেশে যায় তারা বাহিয়া না তরী ॥

রৈয়া রৈয়া চাতক ডাকে বর্ষে জলধর।
না মিটে আকুল তৃষা পিয়াসে কাতর॥
কোন না বিরহী নারী হায় অভাগিনী।
অভেদ নাহিক জানে দিবস রজনী॥
শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরি মাথে।
বউ কথা কও বলি কান্দি ফিরে পথে॥

পরবর্ত্তী বাঙ্গালা কবিদের মধ্যে ঈশ্বরগুপ্তই বিশেষ ক'রে উল্লেখ-যোগ্য। তিনি বর্ষার মধ্যে যে গ্রীষ্মের গুমোট হয় তার বর্ণনা করেছেন, গ্রীষ্মের সঙ্গে লড়াই ক'রে বর্ষা কেমন ক'রে তার বিক্রম বিস্তার করে তার বেশ realistic বর্ণনা দিয়েছেন, খুব ঝমাঝম বর্ষার বর্ণনা দিয়েছেন, বর্ষা হওয়ার পর চারিদিক কেমন শীতল হ'য়ে যায় তারও বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনাগুলি একদিকে যেমন realtstic, অপরদিকে তেমনি pragmatic অর্থাৎ বর্ষাকালে কেমন ছারপোকা হয়, মশা হয়, বর্ষাকালে সাহেবরা কি করে, বাঙ্গালীরা কি করে, মুসলমানেরা কি করে এর কোন কথাই তিনি বলতে ছাড়েন নি।

কি কব দুখের দশা, দিনে মাছি রেতে মশা,
দুই কালে বন্ধু দুইজন;
শয্যায় ভার্য্যার প্রায় ছারপোকা ওঠে গায়
প্রতিক্ষণ করে আলিঙ্গন।

কিন্তু এ সত্ত্বেও ঈশ্বর গুপ্তের বর্ণনার মধ্যে নানাস্থানে অনেক চমৎকারিত্ব আছে।

কিন্তু কালিদাসের পরই রবীন্দ্রনাথ বর্ষার চরম কবি। রবীন্দ্রনাথের বর্ষা কবিতার একটা মোটামুটি সমালোচনাও এতটুকু প্রবন্ধে হওয়ার উপায় নাই। realism থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ idealism-এর চরমে উঠেছেন। সে idealism কালিদাস থেকে সুরু ক'রে কালিদাসকেও অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। ঝর ঝর ক'রে বর্ষা ঝরছে—

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউষের ক্ষেত জলে ভরভর,
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে, দেখ চাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।

আবার

উন্মদ পবনে যমুনা তর্জ্জিত ঘন ঘন গর্জ্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠিত থর থর কম্পিত দেহ॥
ঘন ঘন রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ বরখত নীরদ পুঞ্জ।
শাল পিয়ালে তালতমালে নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ॥

মেঘ করে আসছে,—

মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার ক'রে আসে।

জোরে বর্ষা নেমে আসছে

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জনে নীপমঞ্জরী শিহরে,
শিখিদম্পতি কেকাকল্লোলে বিহরে।
দিগ্বধূ-চিত-হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে উন্মাদ বরষা।

এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের স্বাতন্ত্র্য সরিয়ে রেখে আমাদের দেশের সমস্ত প্রাচীন কবিদলের সভায় নিজেকে আহূত ক'রে সেই সভার মুখপাত্র হ'য়ে বর্ষাকে অভিনন্দন করেছেন

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে,
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শত শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা।

তাই তিনি সেই প্রাচীন সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলছেন

যূথী পরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তমাল কুঞ্জ তিমিরে,
জাগো সহচরী আজিকার নিশি ভুলোনা
নীপশাখে বাঁধ ঝুলনা।

কুসুমপরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পুলকের তুলনা।
নীপশাখে সখি ফুলডোরে বাঁধ ঝুলনা।

কিন্তু বর্ষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই যে দৃষ্টি সেটা তাঁর ঠিক স্বাভাবিক নয়। তাঁর স্বাভাবিক দৃষ্টি হচ্ছে প্রকৃতির বর্ষা থেকে, প্রকৃতির অন্ধকার থেকে অন্তরের রসসিক্ত বর্ষায়, অন্তরের নিভৃত গিরিগুহায় প্রত্যাবর্ত্তন। বর্ষা দেখে তাঁর প্রাণ আপনি-আপনি নৃত্য ক'রে ওঠে, সে নৃত্যের ছন্দ ও গানের সন্ধান সেইখানে পাওয়া যাবে, যে ছন্দে ময়ূর তার কেকাধ্বনি ক'রে নৃত্য করে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির শিশু, তাই প্রকৃতির বর্ষণধারায় স্বাভাবিক আনন্দ।

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে
হৃদয় নাচেরে।
শত বর্ণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ,
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে প্রাণ যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে,
ময়ূরের মত নাচেরে।

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে,
নয়নে লেগেছে।
নবতৃণদলে ঘন বন ছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি বিকশিত প্রাণ জেগেছে,
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে।

বর্ষায় যে প্রিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে কথা বলার একটা আনন্দ আছে, সে সম্বন্ধে কবির ছুটি একটি কবিতা আছে, যেমন ঃ—

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর বরিষায়।
এমন মেঘ-স্বরে বাদল ঝর-ঝরে,
তপনহীন ঘন তমসায়।

* * * *

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার।
ছুজনে মুখোমুখী গভীর ছুখে ছুখী,
আকাশে জল ঝরে অনিবার।
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

* * * *

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়।

কিন্তু বর্ষা ঋতুতে রবীন্দ্রনাথের মনে যে বিরহ জাগায়, সেটি অধিক স্থলেই প্রিয়ার নয়, অন্তরের অন্তরতম প্রিয়ের। কালিদাস যে বিরহটি প্রিয় ও প্রিয়ার অবিনাশী প্রেমের মধ্যে গ'ড়ে তুলেছিলেন, বর্ষাকালের যে বিরহ সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের বর্ণনায় কেবলমাত্র তরুণ-তরুণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকত, রবীন্দ্রনাথের চিত্তে সেই বিরহই তরুণ-তরুণীর সম্পর্ক বর্জ্জন ক'রে মানুষের অন্তরের মধ্যে ধরা-ছোঁয়া যায় না এমন যে একটি অশরীরী আকিঞ্চন আছে তাকেই ফুটিয়ে তুলেছে। ঝম্ ঝমে একঘেয়ে বৃষ্টির ধারা তাঁর মনের তারকে পিড়িং পিড়িং ক'রে সেই একই ভাবে সর্ব্বদা বাজায়—

বাদল বাউল বাজায় রে একতারা,
সারা বেলা ধরে ঝরে ঝর ঝর ধারা।
জামের বনে ধানের ক্ষেতে
আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হল সারা।
ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ মাঝে
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে।

বাদলের ছোঁয়ায় তার প্রাণের মরুভূমি সবুজে পূর্ণ হয়ে যায়—

কখন বাদল ছোঁয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি সবুজ মেঘে মেঘে

* * * *

ওরা যে এই প্রাণের বনে মরু জয়ের সেনা,
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা।

ঝড়ের তালে তাঁর দুটি চোখ সজল হ'য়ে ডুবে যায়, হৃদয়ে ব্যথার তুফান ওঠে—

ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে
বৃষ্টি আসে মুক্ত কেশে, আঁচলখানি দোলে।

ভিজে হাওয়ায় থেকে থেকে
কোন সাথী মোর যায় যে ডেকে ;
একলা দিনের বুকের ভিতর ব্যথার তুফান তোলে

বনের বীণার সুরে—

মন যে আমার পথ হারানো সুরে,
সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে
শোনে যেন কোন ব্যাকুলের করুণ কাঁদারে।

নবীন মেঘের সুরে তিনি নিরুদ্দেশ পথে হারিয়ে যান,

নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে,
ভাবনা যত উতল হল অকারণে।

সে পথ গেছে নিরুদ্দেশে
মানস লোকের গানের শেষে,
চিরদিনের বিরহিণীর কুঞ্জবনে।

শ্রাবণ মেঘের দরজা দিয়ে তিনি তাঁর পথ-ভোলা অতিথিকে দেখতে পান, যে অতিথি তাঁর মনের মধ্যে ব'সে সর্ব্বক্ষণ সুরের জাল বুন্‌ছে—

শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা,
আড়াল থেকে দেখা কোন পথ ভোলা।

* * *

নানা বেশে ক্ষণে ক্ষণে
ঐ ত আমার লাগায় মনে
পরশখানি নানা সুরের ঢেউ তোলা।

বর্ষায় কবির কোন চিত্তবিহারীর বিরহ ব্যথা বাদলধারার সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে—

গগন তল গিয়েছে মেঘে ভরি,
বাদল জল পড়িছে ঝরি ঝরি।

এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরাণ মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।
বাদল জল পড়িছে ঝরি ঝরি।

নিশীথ রাত্রির বাদল ধারায় কবি এই প্রাণের আকিঞ্চনে নিদ্রাহারা হ'য়ে অন্তরের মধ্যে আপনাকে অন্বেষণ করেন, গোপন ক্রন্দনে তাঁর হৃদয় ব্যথায় পূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা,
এস হে গোপনে।

যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে,
নিয়োগো নিয়োগো
আমার ঘুম নিয়োগো হরণ করে।
আমার একলা ঘরে চুপে চুপে
এসো কেবল সুরের রূপে,
দিয়োগো দিয়োগো
চোখের জলে দিয়ো সাড়া।

কবির বর্ষা কবিতাগুলি একটার পর আর একটা যতই আমরা প'ড়ে যাই ততই দেখ্‌তে পাই যে বর্ষার জলধারার আঘাতে আঘাতে

তাঁর সমস্ত অন্তর যেন কোন্ হৃদয়বিহারী প্রিয়তমের বিরহে কখনও বা যেন নিঝুম হ'য়ে রয়েছে, কখনও বা যেন সুরে সুরে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌ছে কখনও বা যেন দীর্ণ বিকীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে।

এই বিরহের সুর ছাড়া আর একটা ভাবধারা কবির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় সেটা তাঁর নূতন কাব্য ঋতুরঙ্গে যেমন প্রকাশ পেয়েছে এমন আর কোথাও নয়। কালিদাসের কাছে ঋতু ছিলেন বন্ধু, ঋতু ছিলেন সখা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে ভিতর বাহির উভয় প্রাঙ্গণ জুড়ে সেই পরমমঙ্গলময় নটরাজের লীলানৃত্য চলেছে। তাই ঋতুর তালে তালে আমাদের চিত্ত নেচে ওঠে, তাই প্রতি ঋতু তার পদের অলক্তকচিহ্ন আমাদের হৃদয়ে রেখে যায়। এই দিক্ থেকে দেখতে পাই যে বর্ষাঋতু—সে সুধু ঋতু নয়, সে নটরাজের এক রূপ, সে ঋতুপুরুষ। সেই ঋতুপুরুষের লীলাবর্ণনাই ঋতুরঙ্গ লীলানাট্যের বিষয়। এ বিষয়ে বিশদভাবে কিছু বলা আর এই প্রবন্ধে চল্‌তে পারে না। কিন্তু এই ঋতুরঙ্গের মধ্যে যে ভাবটি দেখা যায় তাহা একটি বিশেষ ধারাকে অভিব্যক্ত করে। সে ধারাটি হচ্ছে সেই ধারা যাতে কবির চিত্ত তাঁর আপন অন্তরের অন্বেষণে যা পান নি, ভিতর ও বাহিরের মিলনে যে আনন্দলীলা চলেছে সেখানে তাঁকে পেয়েছেন। এই লীলায় আত্মপ্রাপ্তি যথার্থ আত্মপ্রাপ্তির লীলা।

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।

সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে ॥
তোমার চরণ পবন পরশে
সরস্বতীর মানস সরসে
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে,
ঢেউ তুলে দাও মাতিয়ে জাগাও
অমল কমল গন্ধ হে ॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক্ চিত্ত মম ॥

ক্রোচের বীক্ষা-শাস্ত্র বা ইস্থেটিক্

অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন যে, আমাদের লৌকিক স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি অনুভবের সহিত কাব্যরসের উপভোগের এইখানেই পার্থক্য যে, সেখানে প্রমাতা দেশ-কাল-অবস্থা দ্বারা নিজের যে একটা সীমাবদ্ধ প্রকৃতি আছে, তাহা ভুলিয়া যায়। তাহার ব্যক্তিত্বের আবরণ যেন খসিয়া পড়িয়া যায় এবং এইরূপে বিগলিত-প্রমাতৃস্বভাব হইলে তাহার রস-সাক্ষাৎকার ঘটে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র লৌকিক ইন্দ্রিয়ভোগের মধ্যেও এইরূপ আপনাকে হারাইয়া দিতে পারিলে যে উচ্ছল আনন্দ-প্রবাহের সম্ভোগ হয়, তাহার সহিত কাব্য-রসসম্ভোগের একটা জাতিগত ঐক্য আছে। স্বচ্ছন্দ স্পন্দনস্বভাব সেই পরমপুরুষ প্রমাতৃরূপে আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া নিজের সম্মুখে দর্পণের প্রতিবিম্বের ন্যায় জগৎসংসারের যাবতীয় রূপ ফুটাইয়া তুলিতেছেন।

প্রমাতার সঙ্কুচিত স্বভাবের জন্য সেই স্বচ্ছন্দ পুরুষের অনাবিল উচ্ছল আনন্দ সে উপভোগ করিতে পারে না। জগতের যাহা কিছু আমাদের চিত্তপটে ভাসিয়া উঠে, তাহা সমস্তই সেই স্বচ্ছন্দ পুরুষের জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির খেলামাত্র। তিনি নিজে আনন্দময়, তাই তাঁহার শক্তির সমস্ত বিকাশও আনন্দময়। যাহা কিছু আমরা

জানি, যাহা কিছু অনুভব করি—সমস্তই যেন আনন্দদ্বারা নির্ম্মিত। তথাপি সেই আনন্দ আমরা আমাদের সঙ্কুচিত স্বভাবের জন্য অনুভব করিতে পারি না। যদি এমন কোন কারণকলাপের সঙ্ঘটন হয়, যাহাতে আমাদের প্রমাতৃস্বভাবের সঙ্কুচিত অবস্থা দূরীভূত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ আমরা বিপুল আনন্দসম্ভোগের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি ; মধুর গীতবাদ্য শ্রবণে কিংবা চমৎকার দৃশ্য দর্শনে যেমন সময়ে সময়ে আমাদের চিত্ত বিকশিত হইয়া উঠে, তেমনি প্রতিভাবান্ কবির কাব্যশিল্পও আমাদের চিত্তের সঙ্কুচিত অবস্থাকে অপসারিত করে।

এই মত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, একটা দার্শনিক মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, কাব্যানন্দের উৎপত্তি ও বিষয়ানন্দের উৎপত্তি প্রায় একই কারণে হইয়া থাকে। কিন্তু কাব্যরসের অনুভবের সময়ে, কিংবা কাব্যসৃষ্টির সময়ে মানুষ যে তাহার দেশকাল অবস্থা, সমস্ত সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যায়, ইহার কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু কাব্যরসের উপভোগের সময় ইহাই যেন অনুভূত হয় যে, নানা ভাবের নানা অবস্থার ছোট ছোট উপলখণ্ডের মধ্য দিয়া যেন একটী স্বচ্ছ আনন্দনির্ঝর ছল ছল ভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। যদি কোনস্থানে এরূপ হয় যে, শ্রোতা তাহার স্বকীয় স্বভাবকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গিয়া নাটকীয় রসের মধ্যে আপনাকে একান্তভাবে হারাইয়া ফেলেন তাহা হইলে নাটকীয় অলৌকিক রস হইতে অনেক সময়ে লৌকিক রসের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। শুনা যায় বিদ্যাসাগর মহাশয় নীলদর্পণ দেখিয়া এমনই আত্ম-

বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, যাহারা নীলকর সাহেব সাজিয়াছিল, তাহাদিগকে চটি খুলিয়া মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। হয়ত পুলিশ কেস্‌ও হইতে পারিত। কাব্যরস হইতে পুলিশ কেসের উৎপত্তি বাঞ্ছনীয় নহে। যাহা হউক, এ মতের বিস্তৃত সমালোচনা এ প্রসঙ্গে করিব না। এখানে শুধু এইটুকুই দেখাইতে চাই যে, অভিনব গুপ্তের মতে বিষয়ানন্দ যে উপায়ে উৎপন্ন হয়, কাব্যানন্দও সেই উপায়েই উৎপন্ন হয়। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ক্রোচে নামক এক অতি বিখ্যাত মনীষী অন্যরূপ দার্শনিক যুক্তির আশ্রয় লইয়া বিষয়গ্রহণ ও কাব্যসৃষ্টির একরূপতা বর্ণনা করিয়াছেন। অভিনবের মত হইতে এই মত সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও উভয়ের মধ্যে এই অংশে সাদৃশ্য আছে যে, লৌকিক বিষয়রস ও অলৌকিক কাব্যরস—এই উভয়ের মধ্যে একটা জাতিগত সারূপ্য আছে।

ক্রোচের মতে পরমতত্ত্ব বা spirit-এর দুইটী মূল স্বচ্ছন্দশক্তি আছে। একটিকে বলে জ্ঞানশক্তি (theoretic activity), অপরটীকে বলে ক্রিয়াশক্তি (practical activity)। এই জ্ঞানশক্তি বা theoretic activity আবার দ্বিবিধ, বিশেষীকরণাত্মক বীক্ষামূলক বা aesthetic activity ও সামান্যীকরণাত্মক অন্বীক্ষামূলক বা logical activity। ক্রিয়াশক্তি আবার দ্বিবিধ, অর্থানুসন্ধিনী বা economic activity ও শ্রেয়োবিভাবিনী বা moral activity। এই বিশেষীকরণাত্মক শক্তির (aesthetic activity) ব্যবহারে হয় বিশেষোপলব্ধি বা intuition। Aesthetic শব্দটী Greek

Aisthetikos ধাতুটী হইতে নিষ্পন্ন। ঐ ধাতুর অর্থ প্রত্যক্ষ দেখা (to perceive)। সম্ভবতঃ এই Aisthetikos ধাতুটী সংস্কৃত 'ঈক্ষ' ধাতুর সহিত একগোত্রে সম্বদ্ধ। Aisthetikos ধাতুটী প্রধানতঃ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে বুঝায় ও গৌণতঃ যে কোন ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, এমন কি মানসিক সঙ্কলন বা সঙ্কল্প পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে। 'ঈক্ষ' ধাতুটীও এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে মানসিক সঙ্কল্প ও অনুভব পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে। 'তদৈক্ষত বহু স্যাম্'। ইংরেজী 'intuition' শব্দও German 'anschaung' শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। Kant-এর মতে এই anschaung দ্বিবিধ, বিশুদ্ধ (pure) অর্থাৎ যাহাদ্বারা কেবল দেশকালের (space and time-এর) বোধ হয় ও সঙ্কীর্ণ (empirical intuition) অর্থাৎ বিষয়োপলব্ধি ; এই emperieal intuition বা সঙ্কীর্ণ উপলব্ধির লক্ষণ দিতে গিয়া Kant বলিয়াছেন—"Sich auf Gegenstande unmittelbar bezieht" অর্থাৎ যে উপলব্ধি অপ্রতিহতভাবে আপন স্বাচ্ছন্দ্যে বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ। Kant তাঁহার Critique of Pure Reason-এর aesthetic প্রকরণে এই intuition-এর আলোচনা করিয়াছেন। Anschaung শব্দটী বুৎপত্তিগত ভাবে কেবলমাত্র চাক্ষুষ বোধকে বুঝায়, কিন্তু Kant ইহাকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বোধকে বুঝাইবার জন্যই ব্যবহার করিয়াছেন। Kant-এর মতে empirical intuition বলিতে যে কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়জ রূপরসাদির বিশেষ-বোধকে বুঝায়। কিন্তু কোন সামান্যবাচী প্রত্যয় (begriff বা concept) বুঝায় না। ইন্দ্রিয়জ উপাদান

যখন আমাদের মধ্যে তাহার প্রাথমিক স্বলক্ষণ-বিশেষরূপে উপস্থাপিত হয় তখনই তাহাকে বলে intuition, এই intuition-এর মধ্যে সামান্যীকরণ বা সাধারণীকরণ নাই। এই নীল বলিতে যে স্বলক্ষণ রূপ প্রতীত হয় তাহাকে intuition বলা যায়, কিন্তু নীল বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা সামান্যীকরণের ফলে উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাকে intuition বলা যায় না। ইংরেজীভাষায় Kant-এর এই empirical intuition-কে বুঝাইতে গেলে বলিতে হয় যে, "Intuition is the immediate apprehension of a content which as given is due to the action of an indepedently real object upon the mind."

Pure intuition বা বিশুদ্ধ উপলব্ধি কেবলমাত্র দেশকালেরই হইতে পারে। এই বিশুদ্ধ উপলব্ধি হইতে সঙ্কীর্ণ উপলব্ধির (empirical intuition-এর) পার্থক্য এইখানেই যে, উহা উপলব্ধিকালে মন স্বয়ং ইহার নির্ম্মাণ করে। কিন্তু সঙ্কীর্ণ উপলব্ধি বহির্বিষয়ের মনের উপর প্রভাবের ফলেই উৎপন্ন হয়। সেই জন্যই সঙ্কীর্ণ উপলব্ধিকে গৃহীত বা আহৃত বলিয়া বলা যায় এবং বিশেষোপলব্ধিকে মনের মধ্য হইতে উৎপাদিত বলিয়া বলা যায়। বহির্বস্তুর প্রভাবের ফলে যে ইন্দ্রিয়বিষয়কে (sensation) পাওয়া যায়, তাহাকে যখন আমরা উপলব্ধি করি তখন সেই উপলব্ধিকে বলা যায় intuition। এই intuition-এর দ্বারা বহির্বস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন করি।

ক্রোচের মতে বাহ্য জড় পদার্থের কোন সত্তা নাই।

"Physical facts do not possess reality.........The demonstration of the unreality of the physical world hss not only been proved in an indisputable manner and is admitted by all philosophers but is professed by the same philosophy which they mingled with their Physics when they conceive physical phenomena as products of principles that are beyond experience..... The matter itself of the materialists is a super-material principle."

শুধু যে দৃশ্যমান জড়বস্তু নাই তাহা নহে, জড়বস্তু বলিয়া যাহা প্রতিভাত হয়, যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহার কারণীভূত অজ্ঞাত তত্ত্বরূপে Kant-এর Ding an sich-এর মতন কোনও অজ্ঞেয় বা দুর্জ্ঞেয় সত্তাও ক্রোচে মানেন না, কাজেই তাঁহার মতে intuition বলিতে বিশুদ্ধ দেশকালোপলব্ধি বা সঙ্কীর্ণ বিষয়োপলব্ধি (empirical intuition) ইহার কোনটীই পাওয়া যায় না। পরম চিন্ময় তত্ত্ব বা spirit-এর বীক্ষাশক্তিদ্বারা (aesthetic activity) যে উপলব্ধি হয় তাহাকেই intuition বা বিষয়োপলব্ধি বলা যায়।

এই বিষয়োপলব্ধি কোন বহির্বস্তুর জ্ঞান নহে, কারণ, দিক, কাল ও বহির্জগত্ বলিলে আমরা যাহা বুঝি তাহার মূলে অনেক কল্পনা

ও সংস্কারমূলক ব্যাপার নিহিত রহিয়াছে। বীক্ষাশক্তির আপন স্বচ্ছন্দ ব্যাপারে অপরোক্ষভাবে যে রূপরসাদির উপভোগ হয়, তাহাকেই ক্রোচে intuition বা বিষয়োপলব্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বহির্বস্তু নাই বলিয়া বিষয় বলিতেও বাহিরের কোন বস্তু বুঝায় না। উপলব্ধিমাত্রই আমাদের একটী অন্তরঙ্গ আন্তর ধাতুর আত্ম-প্রকাশ। যাহা কিছু মনের সম্মুখে রূপে, রসে বা স্পর্শে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পায় তাহাকেই intuition বা বিষয়োপলব্ধি বলা যাইতে পারে ; চক্ষুর সম্মুখে যে রূপ দেখিতেছি, যে রূপ স্বপ্নে দেখিয়াছি, যাহার কথা এখন স্মরণ হইতেছে, কল্পনার বুকে যাহা ভাসিয়া উঠিতেছে, বিষয়োপলব্ধি রূপে তাহা সকলই সমান সত্য। সমস্তই চিৎপুরুষের বীক্ষাশক্তিদ্বারা উৎপন্ন বলিয়া সমস্তই তুল্যরূপে বিষয়প্রকাশ।

এই বিষয়োপলব্ধি কোনও বাহ্য কারণ দ্বারা উদ্রিক্ত, উত্তেজিত বা উৎপাদিত হয় না, ইহা চিৎপুরুষের আপন স্বচ্ছন্দশক্তিতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়বোধ বলিতে যে রূপসংবিৎ বা শব্দসংবিৎ (sensation) বুঝা যায়, তাহার মধ্যে কেবলমাত্র রূপ বা শব্দ আছে ; কিন্তু যাহার রূপ, যাহার শব্দ, তাহার কোন পরিচয় নাই—উপাদান (matter) আছে, অথচ তাহার আকার প্রকার-প্রকার (form) নাই। বিষয়োপলব্ধি দ্বারা এই আকারপ্রকারযুক্ত একটী সমগ্র অখণ্ড বিশেষ রূপ বা বিশেষ শব্দের সহিত আমরা পরিচিত হই। ইহা আমাদেরই নিজস্বরূপে আত্মপ্রকাশ। চিৎপুরুষ যখন আপন

বীক্ষাশক্তিদ্বারা বিষয়ানুভবরূপে আপনারই একটী অবস্থাকে আপনার নিকট উপস্থাপিত করেন, তখন সেই পরিমাণেই তিনি তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করেন। অনেকে মনে করেন যে, যাহা আমরা অনুভব করি, তাহাই যে আমরা প্রকাশ করিতে পারি এমন নহে। অনেক গভীর বিষয় আমরা হয়ত আমাদের মধ্যে অনুভব করিতে পারি, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারি না।

ক্রোচের মতে ইহা একান্ত ভ্রান্ত। চিৎস্বরূপের স্বচ্ছন্দশক্তিতে যাহা কিছু বিষয়রূপে তাহার সমগ্র বিশিষ্ট সত্তা লইয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, তাহাই আপনাকে সে আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়াই শব্দে, ধ্বনিতে কিংবা বিচিত্র বর্ণে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। চিৎপুরুষের অন্তরের দিক দিয়া দেখিলে, যাহাকে তাহার একটী আত্মোপলব্ধি বলা যায়, তাহাকেই আর একদিক দিয়া দেখিলে শব্দের ধ্বনিতে বা বর্ণের উদ্ভাসে তাহার আত্মাভিব্যক্তি বলিয়া বলা যায়; যে পরিমাণে উপলব্ধি হয়, ঠিক সেই পরিমাণেই অভিব্যক্তি ঘটে। উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি একেবারে অভিন্ন। যাহা অভিব্যক্ত হয় নাই, তাহা অনুভূতও হয় নাই।

"Every true intuition is also *expression*. That which does not objectify itself in expression is not intuition or representation. The spirit does not obtain intuition otnerwise than by making, forming, expressing. Intuitive activity possesses intuitions to the extent that it expresses them".

একজন কবির বিষয়ানুভূতি হইতে গেলেই অনুরূপ শব্দের মধ্য দিয়া সেই অনুভূতির সৃষ্টি হইয়া থাকে, একজন চিত্রকরের অনুভূতি হইতে গেলে সেই অনুভূতিটী নানাবর্ণের বিচিত্র ভঙ্গিমার সন্নিবেশের মধ্য দিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। একজন সঙ্গীতবিদের অনুভূতি হইতে গেলে তাহা সুর তান লয়ের মধ্য দিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু কোনও রূপের অভিব্যক্তি না থাকিয়া কোন অনুভূতি হয় না। কোন কবি যখন তাঁহার কাব্য-সৃষ্টির অনুভূতির মধ্যে আবিষ্ট থাকেন, তখন সেই অনুভূতি-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তদনুরূপ শব্দ-সৃষ্টিও চলিতে থাকে। শব্দ-সৃষ্টি ছাড়া কবির কোন স্বতন্ত্র অনুভূতি নাই। অনুভূতি হইতে গেলেই তাহা বিশিষ্ট শব্দ-সন্নিবেশ-পরম্পরার মধ্য দিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

"The intuition and expression together of a painter are pictorial ; that of a poet are verbal, but be it pictorial or verbal or musical or whatever else it be called, to no intuition can expression be wanting because it is an inseparable part of intuition."

অনেকে বলেন যে, কাব্যসৃষ্টি বা রূপসৃষ্টির মূলে বিষয়োপলব্ধি থাকিলেও বিষয়োপলব্ধিমাত্রকেই কাব্যসৃষ্টি বা রূপসৃষ্টি বলা যায় না। কিন্তু ক্রোচে ইহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, রূপানুভূতি বা বিষয়ানুভূতি ছাড়া রূপায়ণ বা art-এর মধ্যে কোনও নূতন প্রকারের বিভাবনব্যাপার নাই। কোন রূপায়ণিক অনুভূতির (artistic intuition) সহিত কোন সাধারণ বিষয়ানুভূতির অনুভূতিস্বরূপে কোন

প্রকারগত তারতম্য নাই। যাহা কিছু তারতম্য থাকিতে পারে তাহা কেবল পরিমাণের দিক দিয়া বা ব্যাপকতার দিক দিয়া। একটী শব্দকেও কাব্য বলা যায়, একটী বাক্যকেও কাব্য বলা যায়, একটী শ্লোককেও কাব্য বলা যায়; আবার মহাভারতকেও কাব্য বলা যায়। রূপায়ণিক শক্তি (artistic power) বলিয়া কোন স্বতন্ত্র শক্তি নাই। রূপায়ণিক শক্তি বলিতে আমরা রূপোদ্ভাসিনী শক্তি বুঝিতে পারি অর্থাৎ যে শক্তিদ্বারা চিৎপুরুষ আপনারই অন্তরঙ্গ অবস্থা রূপে, বর্ণে, চিত্রে বা সুর তানের মধ্য দিয়া রূপ বা শব্দকে আপনার নিকট উপস্থাপিত করেন। এই রূপোদ্ভাসিনী শক্তিই বিষয়োদ্ভাসিনী শক্তি বা বিষয়ানুভূতি।

একই বীক্ষাশক্তি (aesthetic activity) একদিকে যেমন বিষয়ানুভূতিকে উৎপন্ন করে, অপরদিকে তেমনি শব্দে ও বর্ণে তাহা প্রকাশ করে। রূপায়ণিক প্রতিভা (artistic genius) বলিয়া কোন স্বতন্ত্র প্রতিভা নাই। ন্যূনাধিক পরিমাণে এই শক্তি সকলের মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে কোনও রূপকারের রচনা অপরের চিত্তে আনন্দোৎপাদন করিতে পারিত না। চিত্তের রূপোদ্ভাসিনী বৃত্তির ফলে যাহা কিছু উদ্ভাসিত হয়, প্রকাশিত হয়, তাহাকেই রূপায়ণ বলে এবং এই হিসাবে মনুষ্যমাত্রই রূপকার। প্রত্যেকটী শব্দ ব্যবহারের পিছনেই একটা রূপসৃষ্টি ও রূপের অভিব্যক্তি রহিয়াছে, কিন্তু এমন ঘটিয়া থাকে যে, অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড রূপোপলব্ধি বা রূপানুভূতি আপনাদিগকে পরস্পরের মধ্যে

অন্বিত করিয়া একটী অখণ্ড রূপানুভূতির মধ্য দিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ করে।

কোনও একটী ছবিকে তাহার অভিন্ন অবয়বের মধ্য দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, কিম্বা কোন কাব্যকে শ্লোকবিশেষের বা শব্দবিশেষের সমষ্টি বলিয়া মনে করিলে তাহাদের চিত্রত্ব ও কাব্যত্ব ব্যাহত হয়। সমস্ত খণ্ড অনুভূতিগুলি পরস্পরের মধ্যে পরস্পরকে প্রকাশ করিয়া একটী অখণ্ড উপলব্ধি বা অনুভূতিকে প্রকাশ করে এবং এইটাই রূপায়ণের বিশেষত্ব—একটী শব্দও যে হিসাবে অখণ্ড কাব্য, রামায়ণও সেইরূপ একটী অখণ্ড কাব্য। উভয়ের পার্থক্য কেবলমাত্র পরিমাণগত ব্যাপতকায়। ইহা ছাড়া ইহাদের উভয়ের মধ্যে কোন প্রকারগত বিজাতীয়তা নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উপলব্ধি বা অনুভূতির দ্বারা যেটী উদ্ভাসিত হয়, সেটী একটী বিশেষ রূপ, কিন্তু সেই রূপের মধ্যেই আর একটী অন্বীক্ষামূলক—সাধারণীকরণাত্মক বিশিষ্ট ধর্ম্মও প্রতিভাত হয়। 'এই নদী' বলিতে যাহা অনুভূত হয়, তাহাকে বীক্ষামূলক অনুভূতি বলা যায়। কিন্তু ইহারই মধ্যে অন্বীক্ষামূলক নদী নামক একটী সাধারণ ধর্ম্ম গর্ভিত হইয়া রহিয়াছে। সহস্র অনুভূতির মধ্য দিয়া অনন্তকাল ধরিয়া নদীরূপী এই গর্ভিত সাধারণ রূপটী 'এই নদী, এই নদী' বলিয়া অনুভূত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক বিশেষোপলব্ধির মধ্যেই এই সাধারণ উপলব্ধিটী তাহার বিশিষ্ট সত্তায় আপনাকে প্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছে। বিশেষ রূপকে অবলম্বন করিয়াই এই সাধারণ রূপের প্রকাশ।

বিশেষ রূপের বেলাও যেমন বলা যায় যে, তাহার উপলব্ধিই তাহার প্রকাশ, এই সাধারণ রূপ বা concept-এর বেলাও সেইরূপ বলা যায় যে, তাহার বিভাবনাই তাহার প্রকাশ। এই অন্বীক্ষা ব্যাপারের আর একটা দিক আছে যাহাকে বলা যায় বিকল্প (pseudo-concept)। এই বৃত্তিদ্বারা কোন অদৃষ্টবস্তুকে অবলম্বন করিয়া তাহার কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্মের একটা জাতিরূপ প্রত্যয় হয়। এতদনুরূপ কোন বস্তু নাই, অথচ ইহা লইয়া চিন্তার ব্যবহার চলে। ক্রোচের মতে ইহাকে বলে empirical concept বা মূর্ত্তজাতি।

আবার ইহা ছাড়া আর একরূপ অমূর্ত্ত জাতিপ্রত্যয় আছে, যাহার অনুরূপ স্বলক্ষণ বস্তুও নাই। যেমন রেখা (line), বিন্দু (point), ত্রিকোণ (triangle)—ইহাদের অনুরূপ কোন মূর্ত্ত বস্তু নাই, অথচ বিকল্পবৃত্তি দ্বারা ইহাদের একটী প্রত্যয় উপস্থিত হয়। এই বৈকল্পিক বৃত্তিগুলির ব্যবহারে গণিতশাস্ত্র এবং পদার্থশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। সেইজন্য ক্রোচের মতে এই শাস্ত্রগুলির মূলে কোন বাস্তব সত্য নাই। ইহা বিকল্পবৃত্তি দ্বারা নির্ম্মিত এবং এই বিকল্পের রাজ্য হইতে ইহারা কখনই বাস্তব রাজ্যে আসিতে পারে না। ইহাদের সহিত অনুস্যূতভাবে কোন অনুভূতি বা উপলব্ধি নাই। উপলব্ধিকে পরিত্যাগ করিয়া কিংবা উপলব্ধিকে আশ্রয় না করিয়াই কতকগুলি পরিকল্পিত সাধারণ ধর্ম্মের উপর আশ্রয় করিয়া কৃত্রিম নাম, জাতি প্রভৃতি দ্বারা ব্যবহারযোগ্য হইয়া সত্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছে মাত্র।

অন্বীক্ষার মূল বৃত্তির সহিত ইহাদের এইখানেই পার্থক্য যে, অন্বীক্ষার

(concept) মধ্যে দেখা যায় যে, একটী সঙ্কলন বা সঙ্কল্পই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু অন্বীক্ষাভাসের (pseudo-concept) প্রধান হইয়াছে বিকল্পবৃত্তি,—বিশ্লেষণবৃত্তি। একটী অনুভূত তত্ত্বকে না পাইলে, একটী মূর্ত্ত বিষয়োপলব্ধিকে না পাইলে অন্বীক্ষার ক্রিয়া চলিতে পারে না। বীক্ষা-ব্যাপারের (aesthetic activity) দ্বারা যখন আমাদের অন্তরের মধ্যে তাহার অন্তরঙ্গ হইয়া একটী বিষয়োপলব্ধি শব্দ বা বর্ণের উদ্ভাসে প্রকট হইয়া উঠে, তখন তাহার মধ্যে আমরা এমনই ডুবিয়া যাই, এমনই একটা নির্ব্বিকল্পবৎ অবস্থার উদয় হয় যে, যে অবস্থায় আমি ইহা অনুভব করিতেছি, আমার অনুভবটী এইরূপ—এই রকমের কোনও বিশিষ্ট প্রকারপ্রকারীভাবে অনুভবটী প্রকাশিত হয় না। যখন আমরা বলি, আমিই এই সুন্দর বর্ণচ্ছটা দেখিতেছি, তখন বর্ণচ্ছটাটী যে কেবলমাত্র অন্তরের মধ্যে অনুভূত হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু একটী অনুভূত বর্ণচ্ছটা রহিয়াছে, সেটী আমার নিজের সহিতই একীভূত, আমারই একটী বিশেষ উপলব্ধি এবং তাহা সুন্দর—এই ত্রিবিধ সঙ্কলন ব্যাপার ইহার মধ্যে সমাহিত হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বলিলেই বুঝিতে হয় যে একটী অনুভূতি একটী বিশেষ প্রকার বা স্বরূপ সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা হইতেছে—"To perceive means to apprehend a given fact as having this or that quality and therefore to think and to judge it."

এই যে একটী অনুভূত রূপায়ণিক তত্ত্ব নিজেরই অন্তরঙ্গ

অবস্থারূপে ও 'সুন্দর' রূপে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইল, ইহারই নাম অন্বীক্ষাব্যাপার; শুধু বীক্ষাব্যাপারের দ্বারা বিষয়োপলব্ধিটী কেবলমাত্র হৃদয়ের মধ্যে ভাসিয়া উঠে। সেখানে কোন প্রমাতৃপ্রমেয় ভাব থাকে না, জ্ঞাতা জ্ঞেয় ভাব থাকে না। কেবলমাত্র একটী উপলব্ধি চিত্তকে পূর্ণ করিয়া রাখে। সেই উপলব্ধিটীর মধ্যেই গর্ভিত হইয়া থাকে একটী অন্বীক্ষা-ব্যাপার, যাহার ফলে তাহা প্রকারপ্রকারীভাবে আপনাকে প্রকট করিয়া তুলে। বীক্ষা ও অন্বীক্ষার মধ্যে সেইজন্য কোন গুরুতর ব্যবধান নাই। বীক্ষা না হইলে অন্বীক্ষা শূন্যময় ও উপাদানহীন। অন্বীক্ষা না হইলে বীক্ষার আত্মপ্রকাশে পরিপূর্ণতা হয় না, কিন্তু অন্বীক্ষা যেমন বীক্ষা না হইলে থাকিতে পারে না, বীক্ষার বেলায় কিন্তু সেইরূপ নহে। বীক্ষা লইয়াই আমাদের জ্ঞান-ভূমির প্রথম আরম্ভ এবং এই বীক্ষা-ব্যাপারের দ্বারায় যে অনুভূতিটী রূপ বা শব্দ লইয়া চিত্তের মধ্যে ফুটিয়া উঠে, তাহাকে এক দিকে যেমন অনুভূতি বলা যায়, আর একদিকে তেমনি প্রকাশময় বলা যায়। কারণ তাহা চিত্তে ফুটিয়া উঠিবার সময়েই তাহার একটী বিশিষ্টরূপ বা বিশিষ্ট শব্দসমবায় লইয়া ফুটিয়া উঠে। শব্দসৃষ্টি হয় নাই অথচ অনুভূতি সৃষ্টি হইয়াছে, এরূপ হইতে পারে না।

রূপায়ণের (art) মধ্যে কেবল পাওয়া যায় একটা অনুভূতি। সে অনুভূতি বাস্তব কি অবাস্তব, তাহা অতীত কি বর্ত্তমান, তাহা স্বপ্ন কি কল্পনা, তাহার কোন বিচার নাই—এই হিসাবে রূপায়ণিক উপ-লব্ধিই হইতেছে আমাদের আদিম উপলব্ধি।

"L' arte si regge unicamente sulla fantasia : la sola sua ricchezza sono li immagini. Non classifica gli oggetti, non li pronunzia reali o immaginari, non li qualifica, non li definisce : li sente e rappresenta. Niente di piu'. E perció, in quanto essa é conoscenza non astratta ma concreta e tale che coglie il reale senza alterazioni e falsificazione, l' arte é *intuizione* ; e, in quanto lo porge nella sua immediatezza, non ancora mediato e rischiarato dal concetto, si deve dire intuizione pura"—L' INTUIZIONE E IL CARATTERE LIRICO DELL'ARTE.

রূপায়ণের (art) একমাত্র সম্পদই হইতেছে রূপচ্ছবি ও ভাবচ্ছবি। রূপায়ণিক ব্যাপারের মধ্যে কোন জাতি-প্রতীতি নাই, কোন সত্য, কি কল্পনা, তাহার উল্লেখ নাই, কোন প্রকারপ্রকারীর নির্দ্দেশ নাই, কোন লক্ষণের দ্বারা লক্ষ্য নির্দ্দেশের চেষ্টা নাই। ইহাতে আছে কেবল অনুভব এবং তাহার ফলে অনুভূতি বা উপলব্ধি—ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। যে পরিমাণে কোন উপলব্ধি জাতিকল্পনারহিত মূর্ত্ত অনুভূতি এবং যে পরিমাণে আর কোনরূপ আরোপ না করিয়া এই মূর্ত্ত অনুভূতিটী আত্মপ্রকাশ করে, সেই পরিমাণেই সে আত্মপ্রকাশের সহিত অভিন্ন অনুভূতিটীকে রূপায়ণিক অনুভূতি বা art intuition বলা যাইতে পারে।

বিকল্পবৃত্তিদ্বারা কোন অনুভূতি যে পর্য্যন্ত না প্রকারপ্রকারীভাবে স্পষ্টীকৃত ও রূপান্তরিত না হয়, অনুভূতির সেই দশাটীকেই বিশুদ্ধ অনুভূতি বা art intuition বলা যায়। ক্রমশঃ এই রূপায়ণিক বিশুদ্ধ অনুভূতি স্বগর্ভস্থিত অন্বীক্ষাব্যাপারের ফলে প্রকারপ্রকারীভাবে ও অন্য নানা উপায়ে বিশদীকৃত ও রূপান্তরিত হইয়া আপনাকে প্রকাশ করে। এই রূপান্তরিত সবিকল্প প্রকাশের মধ্যে অন্বীক্ষাভাস, প্রকার-প্রকারীভাব ও রূপায়ণিক অনুভূতি এই ত্রিবিধসত্তা সংমিশ্রিত হইয়া থাকিলেও রূপায়ণিক অনুভূতিটীর গোত্রমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না।

শবরগ্রামে এক ঘর ব্রাহ্মণ পরিবার থাকিলে সে যেমন গোত্র-মর্য্যাদায় ব্রাহ্মণই থাকে, রূপায়ণিক অনুভূতিটীও তেমনি অন্বীক্ষা ও অন্বীক্ষাভাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকিলেও ইহার স্বরূপের স্বতন্ত্র মর্য্যাদা কখনই ব্যাহত হয় না। ইহার নিরাভরণ নগ্নতা ও দারিদ্র্যই ইহার ভূষণ। (cosi nuda, cosi povera sta la forza dell'arte)।

যেমন আত্মার সহিত দেহের কোন বিভাগ করা যায় না তেমনি অনুভূতির সহিত ভাষারও কোন বিভেদ করা যায় না, কেবল শব্দ বা ধ্বনির সহিত ভাষার এই পার্থক্য যে, ভাষা প্রকাশময়। প্রকাশ মাত্রই অনুভূতিময়। কাজেই অনুভূতি ও প্রকাশ একই বস্তু। এই হিসাবে ভাষাশাস্ত্রের (linguistic) সহিত বীক্ষাশাস্ত্রের (aesthetics) একটী সম্পূর্ণ ঐক্য রহিয়াছে। অনুভূতির ক্রমসম্প্রসারণেই নূতন শব্দ ও নূতন অর্থের সৃষ্টি। কোনও নূতন শব্দ বা নূতন অর্থের সৃষ্টি

তদ্‌গত অনুভূতির নবতর সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে। ব্যাকরণ যে দৃষ্টিতে ভাষাকে দেখে এবং যে ভাবে ভাষাকে বিশ্লেষণ করে, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অধিকরণ প্রভৃতিতে বিভক্ত করে, তাহা ভাষার স্বরূপ-দৃষ্টি নহে। তাহার মধ্যে আমরা পাই একটা অন্বীক্ষাভাসমূলক (pseudo-concept) বিকল্পদৃষ্টি বা মিথ্যাদৃষ্টি, যাহা দ্বারা অখণ্ড মূর্ত্ত-ভাষাকে মিথ্যা ও কল্পিত, খণ্ড ও অংশের মধ্যেই বিভক্ত করিয়া আবার মিথ্যা সম্বন্ধের পরিকল্পনার দ্বারাই সেই অংশগুলিকে জোড়া দিবার একটী বৃথা প্রয়াস। অনুভূতির নিত্য নবতর সৃষ্টিই ভাষার নিত্যসৃষ্টি। কালিদাস বলিয়াছেন যে, বাক্যের সহিত অর্থের একটী নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, কিন্তু ক্রোচে বলেন যে, অর্থই বাক্য, বাক্যই অর্থ। বাক্য-রূপ গ্রহণ না করিয়া, কোন অর্থই অর্থরূপে প্রতিভাত হইতে পারে না।

অনুভূতি বলিতেই আমরা বুঝি কোন অর্থ বা বিষয়ের স্বোপলব্ধি বা স্বপ্রকাশতা, যে পরিমাণে এই উপলব্ধিটী পরিস্ফুট ও ব্যাপক হইবে, সেই পরিমাণেই তাহা স্বানুরূপ ভাষার সহিত অন্বিত হইয়া থাকিবে। এই ভাষা সকল সময়েই স্বকীয় অনুভূতির সহিত চিত্তের মধ্যে প্রকট হইয়া থাকিবে। ভাষা বলিতে এখানে কেবলমাত্র ধ্বনি বুঝায় না, বর্ণ (colour) ও রেখাকেও ভাষা বলা যায়। কোন অনুভূতি চিত্তের মধ্যে প্রকট হইয়া উঠিলেই যে পরিমাণে তাহা চিত্তের মধ্যে ধ্বনি রেখা বা বর্ণের দ্বারা পরিমিত হইয়া প্রকাশ পায় তাহাই সেই অনুভূতির ভাষা। এই ধ্বনি রেখা বা বর্ণের পরিমাণ দ্বারাই অনুভূতির পরিমাণের তারতম্য নির্দ্দেশ করা যায়। যখনই কোনও অনুভূতি ধ্বনির মধ্য

দিয়া চিত্তে প্রকাশ লাভ করিল, তখনই 'সুন্দরে'র সৃষ্টি হয়। অনুভূতিটী যত ব্যাপক, স্ফুট ও বিশদ হইবে ততই তাহাকে সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইতেছে—এই কথা বলা যাইবে। যে পরিমাণে ব্যাপক স্ফুট, উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, সেই পরিমাণেই 'সুন্দরে'র পরিচয় পাওয়া যায়। অনুভূতির আত্মপ্রকাশের নামই সৌন্দর্য্য। প্রত্যেক অনুভূতি সৃষ্টির সঙ্গে বীক্ষাশক্তির যে ব্যাপার চলিয়াছে সেই ব্যাপারের আত্মপ্রকাশেই আনন্দ ও সুখের অনুভব। ইহা ছাড়া আনন্দ বা সুখ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র ব্যাপার বা স্বতন্ত্র ক্রিয়া নাই। বীক্ষাব্যাপারের ফলে যেমন অনুভূতি ও তাহার প্রকাশ সম্পন্ন হয়, সেইরূপ সেই ব্যাপারেরই ফলে সেই অনুভূতির সহিত রসানুষিঞ্চন বিধৃত হইয়া থাকে। এই রসানুষিঞ্চন বা রসাভিব্যক্তি অনুভূতির সহিত অভিন্ন, অনুভূতিরই একটী আস্বাদ্যমান স্বরূপমাত্র। সেই কাব্য পড়িয়াই আমরা মুগ্ধ হই, যাহাতে ভাবসংবেশে আমাদের হৃদয় নাচিয়া উঠে। অমৃতনিষিঞ্চনে যেন আমাদের শ্রোত্র উৎফুল্ল হইয়া উঠে, নূতন নূতন ভাবচ্ছবিতে চক্ষু যেন রসাপ্লুত হইয়া উঠে। যে কাব্যের অনুভূতি যত গভীর, যত ব্যাপক, যত মূর্ত্ত, বিশদ এবং স্ফুট, সেই কাব্যেরই মধ্যে কবি আপনার প্রাণের দরদকে সুব্যক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কবির কাছে আমরা কোন শিক্ষা চাই না, তাঁহার কল্পনার সম্পদ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে চাই না, আমরা শুধু এইটুকু চাই যে, তাঁহার হৃদয়ে একটা দরদ আছে এবং তাঁহার কাব্যে তাঁহার সেই দরদ এমনভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে যে, তাহার স্পর্শে আসিয়া শ্রোতা বা দর্শকের চিত্ত ভাবাবিষ্ট

হইয়া উঠে। এই দরদের অভিব্যক্তিকে ক্রোচে personality বলিয়াছেন। এই personality-র আত্মাভিব্যক্তির সহিত নৈতিক চরিত্রগত উৎকর্ষের কোন সম্বন্ধ নাই। সুখে, দুঃখে, ভয়ে, ক্রোধে, লজ্জায়, বীভৎসতায়, লোলুপতায়, লালসায় যে রকম করিয়াই হউক না কেন, একটী প্রাণ কাব্যের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়াছে কি না, ইহা প্রধান লক্ষ্য। (Un' anima lieata o triste, entusiatica o sfiduciate, sentimentale o sarcastica, benigna o maligna ; ma un'anima.) যে কাব্যে সুখে, দুঃখে, উৎসাহে, আবেগে কবিপুরুষের চিত্তাভিজ্বলন কাব্যের মধ্য দিয়া শ্রোতা বা দ্রষ্টাকে প্রত্যভিজ্বালিত করিয়া তুলিতে না পারে, তাহাকে উচ্চ অঙ্গের রূপায়ণ (art) বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অনেক সময় এ কথা শুনা যায় যে, উচ্চ-অঙ্গের রূপায়ণের একটা প্রধান লক্ষণই এই যে, সেখানে কবি তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্বকে বিলোপ করিয়া দিয়া কাব্যের নায়ক-নায়িকার রস-সম্ভার স্ফুট করিয়া তুলেন। সেইজন্য এই কথা বলা যায় যে, যে কাব্য যে পরিমাণে কবির ব্যক্তিগত জীবনের অনাবশ্যক-অনধিকার প্রবেশ হইতে বিনির্ম্মুক্ত, সেই পরিমাণেই সেই কাব্যকে কাব্য বলা যায়। কিন্তু এই মত ও পূর্ব্ব মতের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নাই, কারণ কাব্য-সৃষ্টির রস-সম্ভোগের মধ্যে কবির যে ব্যক্তিত্বের আত্ম-প্রকাশ দেখিতে পাই, কবির দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের ব্যক্তিগত ইতিহাস যদি তাহার মধ্যে বিনা কারণে প্রবেশ করিয়া সেই সাহিত্যিক আত্মাভিব্যক্তির পথে বিঘ্ন

উৎপাদন করে, তবে তাহা কাব্য-সৃষ্টির ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। কাজেই personality বা ব্যক্তিত্ব বলিতে আমরা দুইটী বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিত্বকে বুঝিয়া থাকি। একটীকে বলা যায় কবির প্রাকৃত জীবনের ব্যক্তিত্ব (empirical ও volitional personality) আর একটীকে বলা যায় কাব্য-সৃষ্টির অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব (spontaneous or ideal personality constituting the subject of the work of art)। মহাকাব্যই হউক আর নাটকই হউক—সর্ব্বত্রই নাটকীয় বা কাব্যগত পাত্র-পাত্রীর মধ্য দিয়া যে নানাবিধ ভাবসংবেগ ফুটিয়া উঠে, তাহার মূলে কবি-হৃদয়ের একটা ভাবদ্রবণ না থাকিয়াই পারে না। এই ভাবদ্রবণ তাঁর ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের দ্রবণ নহে, ইহা একরূপ অপ্রাকৃত ভাবসংবিদ্। এইজন্যই ইহাকে ক্রোচে spontaneous and ideal personality বলিয়া বলিয়াছেন।

এখন আপত্তি হইতে পারে এই যে, কাব্যসৃষ্টি বা যে কোন রূপায়ণ সৃষ্টির মূলে যদি এই অপ্রাকৃত ভাবদ্রবণ একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র বিষয়ানুভূতিকেই রূপায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা সুসঙ্গত নয়। ইহার উত্তরে ক্রোচে বলেন—এই যে চিত্তের দ্রবী-ভাব, ইহা অনুভূতিরই একটী রূপমাত্র। অনুভূতির বিষয়গুলিকে কবি বা চিত্রী যখন তাঁহার বীক্ষাশক্তিদ্বারা আত্মানুভূতিতে পরিণত করেন, তখন সেই পরিণামের সহিতই যে ভাবোদ্বেগ উচ্ছল হইয়া উঠে, তাহা সেই অনুভূতিরই স্বরূপভূত। অনুভূতিমাত্রেই আমাদের চিৎপুরুষের একটি অবস্থা-বিশেষের দ্যোতনা করে। চিৎপুরুষের দ্যোতনামাত্রেই

ভাবদ্রবাত্মক। ভাবদ্রবণ না থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে, সেখানে যথার্থ অনুভূতি নাই। 'মা নিষাদ' এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিবার সময়ে বাল্মীকির হৃদয়ে যে ভাবময় সংবিৎ উপস্থিত হইয়াছিল, সমস্ত রামায়ণের সম্পূর্ণ অনুভূতিটী তাহারই মধ্যে নিহিত হইয়াছিল। যখন একজন চিত্রী জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সাগর-সৈকতে একটী ছবি আঁকেন, তখন সেই সমস্ত সৈকত-ভূমিই ভাবপ্রচুর হইয়া তাঁহার চিত্তের একটী অন্তরঙ্গ অবস্থারূপে উপস্থাপিত হয়। তাই ক্রোচে বলিতেছেন, Un paesaggio é uno stato d'animo অর্থাৎ একটী প্রাকৃতিক দৃশ্যও আমাদের চিৎপুরুষেরই একটী অবস্থাবিশেষ ; un gran poema potrebbe contrarsi tutto in un'esclamazione di gioia, di dolore, একটী আনন্দোচ্ছ্বাসের শিহরণের মধ্যে কিংবা একটী বেদনার আর্ত্তনাদের মধ্যে একটী মহাকাব্যের অনুভূতি প্রকট হইয়া থাকিতে পারে। চিৎপুরুষেরই অভিব্যক্তির স্বরূপ বলিয়া অনুভূতি-মাত্রেরই সহিত ভাববিদ্রুতি অপরোক্ষভাবে সংসক্ত হইয়া রহিয়াছে। যদি কেহ ইচ্ছানুসারে নানা দৃশ্যের ছবি, নানা ঘটনার ছবি মনের চিত্রপটে সাজাইয়া দেয়, তবে সে সন্নিবেশের ফলে কোন কাব্য-রচনা বা চিত্র-রচনা হয় না, কারণ ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা করা হয়, তাহা চিত্তের অন্তরঙ্গ অবস্থা নহে। চিৎপুরুষের আপন স্বচ্ছন্দ শক্তিতে যাহা সৃষ্ট হইয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহাকেই চিৎপুরুষের অন্তরঙ্গ অবস্থা বলে, তাহাকেই বলে অনুভূতি এবং তাহারই সহিত প্রকাশ পায় চিত্তের দ্রবীভাব। যে ছবি চিৎপুরুষের আত্মানুভূতিরূপে প্রকাশ পায় না,

কেবল বহিরঙ্গরূপে জ্ঞানগোচর হয়, তাহাকে অনুভূতি বলা যায় না। অনুভূতিমাত্রেই চিৎপুরুষের অবস্থাবিশেষ, এইজন্যই ইহা কাল্পনিক নহে, কৃত্রিম নহে। ইহার মূলে একটী সহজ সত্য আপনাকে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে, সেইজন্যই বহিরঙ্গ অনুকরণের দ্বারা কখনও ইহাকে পাওয়া যায় না। যেখানে দ্বৈতবোধ আছে, সেখানেই এই অনুভূতি বিধ্বস্ত হইয়াছে। যখন আমরা বাহিরের জগতের দিকে তাকাইয়া দেখি, তখন আমরা হয়ত দেখি যে, আমাদের চারিদিকে নানা পত্রপুষ্পশোভিত তরু-গুল্ম, নদী, শৈল, কান্তার রহিয়াছে। কিন্তু যখনই আমরা এই সমস্ত বস্তুগুলিকে আমাদের হইতে পৃথক করিয়া বহির্বস্তুরূপে, জ্ঞেয়রূপে স্বতন্ত্র করিয়া দেখি, তখনই ইহাদের অনুভূতিত্ব ও রূপায়ণত্ব ধ্বংস হইয়া যায়। অনুভূতিমাত্রই চিৎপুরুষের অভিন্ন, অন্তরঙ্গ ও অপরোক্ষস্বভাব। জ্ঞাতাজ্ঞেয়রূপে বিভাগ করিলেই অনুভূতির অন্তরঙ্গতা ও চিৎপুরুষের সহিত অভিন্ন অদ্বৈতত্ব ব্যাহত হয়।

এখন কথা উঠিতে পারে এই যে, অনুভূতিমাত্রই যদি চিৎপুরুষের স্বস্পৃষ্ট অন্তরঙ্গস্বভাব হয়, তাহা হইলে তাহার মধ্যে অন্য ব্যক্তিরা কি উপায়ে প্রবেশ করিতে পারেন। যে জীবন একবার যাপন করা হইয়াছে, যে ভাবাবেগ একবার অনুভূত হইয়াছে, যে বাসনা একবার নিজকে প্রকাশ করিয়াছে, তাহাকে পুনরায় আবর্ত্তন করা সম্ভব নহে। একবার যাহা ঘটে তাহাকে পুনরায় ঘটান যায় না এবং আমাদের প্রত্যেকের জীবন দেশকালঘটনা-চক্রের দ্বারা এমনই ভাবে বর্ত্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ যে, আর কাহারও অনুভবের সহিত তাহার একান্ত সাম্য

নাই। এমন কি এক ব্যক্তির পক্ষেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুভবের সহিত একান্ত সাম্য নাই। অতএব, অনুভূতি চিৎপুরুষের অন্তরঙ্গ স্বভাব হইলে তাহা তাঁহার আপন অন্তরের মধ্যেই বিলীন হইয়া যাইবে—অপর কাহারও সহিত তাহার যোগ থাকিবে না। ইহার উত্তরে ক্রোচে বলেন যে অনুভূতি মাত্রই আত্মাভিব্যক্তি। এই আত্মাভিব্যক্তিই রূপায়ণ এবং রূপায়ণের স্বভাবই এই যে, তাহাতে আপন অন্তরঙ্গ অবস্থাটী সর্ব্বকালের ও সর্ব্বলোকের অনুভবযোগ্য রূপে বিধৃত হইয়া থাকে। তাহা কোন দেশ-কালের মধ্যে নিবদ্ধ নহে, তাহা একটী অলৌকিক চিত্তলোকের আত্মপ্রকাশ ; সেইজন্য দেশকাল সম্পর্ক রহিত হইতে পারিলে, সেই চিত্তলোক সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকের নিকট সুপ্রকাশ। এইখানেই রূপায়ণের সার্ব্বজনীনতা। ইহা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের নহে, ইহা দেশের সীমায় সীমাবদ্ধ নহে, চিৎপুরুষের অন্তরঙ্গ অলৌকিক লোকের মধ্যে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহাই বলিতে গিয়া ক্রোচে বলিয়াছেন, “Appartiene non al mondo ma al supramondo, non all'altimo fuggento ma all'eternita.” সেই জন্যই জীবন নশ্বর, কিন্তু রূপায়ণ অবিনশ্বর “Percio la vita passa e l 'arte resta”

এখন কথা উঠিতে পারে এই যে, রূপায়ণকে যদি কেবলমাত্র অন্তরঙ্গ অনুভূতি বলিয়া বর্ণনা করা যায়, তাহা হইলে রূপায়ণ বলিয়া আমরা যে চিত্র বা কাব্য বুঝি, তাহার গতি কি হইবে? যদি রামায়ণটী ক্রৌঞ্চশোকার্ত্ত বাল্মীকির হৃদয়াবেগের একটী অনুভূতিমাত্রই

হয়, তাহা হইলে রামায়ণ বলিতে যে কাব্যখানিকে আমরা দেখিতে পাই, তাহার উৎপত্তি কি করিয়া হইবে, রাফেলের 'ম্যাডোনা' ছবিখানির বা কি গতি হইবে? ইহার উত্তরে ক্রোচে বলেন যে, বহিরঙ্গ ছবি বা বহিরঙ্গ কাব্যকে কোন ক্রমেই রূপায়ণ বলা চলে না। অনুভূতি উৎপন্ন হইলে তাহার অন্তঃস্থিত ইচ্ছাশক্তি তাহার স্বচ্ছন্দ গতিতে লীলায়িত হইয়া বাহ্যবস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে এমন কিছু পরিকল্পনা করে, যাহা দ্বারা সেই বাহ্য বস্তুটী সেই অন্তরঙ্গ অনুভূতিটীর স্মারক হইয়া থাকে। কিন্তু এই বাহ্যীকরণকে রূপায়ণ বলা যায় না। অনুভূতির আত্মপ্রকাশ সম্পূর্ণ হইলেই আত্মার অন্তরঙ্গ অবস্থার মধ্যে রূপায়ণ সম্পূর্ণ হইল। তাহার পর সেই অন্তরঙ্গ অবস্থাকে বহিরঙ্গরূপে প্রকাশ করা না করা কর্ত্তার ইচ্ছাধীন স্বতন্ত্র ব্যাপার। তাই ক্রোচে বলিতেছেন, "It is a distinct moment of the aesthetic activity. Wo cannot will or not will our aesthetic vision. We can however will or not will to externalise it." এই জন্যই অন্তরঙ্গ আত্মপ্রকাশে কোন উপায়-প্রয়োগ বা technique নাই। ইহা আপন স্বচ্ছন্দতায় আপনি উৎপন্ন হয়। কোন অনুভূতিকে যখন বাহ্যিক উপায়ে বিধৃত করিয়া রাখা যায়, তখনই এই উপায়প্রয়োগ বা techniqueএর কথা উঠে। কি রকম তৈলে কি রকম রং মিশাইতে হইবে, চিত্রপটের বস্ত্রখণ্ড মসৃণ হইবে কি ঘন হইবে—এই সব কথার আলোচনাই উপায়প্রয়োগ বা technique-এর আলোচনা। নচেৎ ছবির অন্তরঙ্গ

রূপসন্নিবেশ, তাহার রূপের ছন্দ বা গতি, তাহাতে অঙ্কিত ব্যক্তি বিশেষের পরস্পরের ঠাম, ভঙ্গী প্রভৃতি সমস্তই একান্তভাবে অনুভূতিরই অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম। সম্পূর্ণ ছবিটী তাহার সমস্ত রূপসন্নিবেশ-সামঞ্জস্য ও ছন্দ লইয়া চিত্রীর অনুভূতির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রকট হইয়া রহিয়াছে। কেবলমাত্র বহিরঙ্গ উপাদান ব্যাপার লইয়াই উপায়প্রয়োগ বা technique-এর ব্যবহার। কাজেই কোন্ রকম রং দিয়া, কোন্ রকম শব্দ দিয়া, কোন্ রকম ছন্দ দিয়া, কোন্ রকম উপমা দিয়া কতদূর রূপায়ণিক কৃতিত্ব দেখান যায়, এই সম্বন্ধে সমস্ত গবেষণা একান্ত নিষ্ফল। তাই ক্রোচে বলিতেছেন, "All the books dealing with classifications and systems of the art could be burnt without any loss whatever." যতক্ষণ রূপায়ণকে তাহার যথার্থ স্থানে চিৎপুরুষের অন্তরঙ্গ অনুভূতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই ততক্ষণ তাহা স্বতন্ত্র এবং স্বচ্ছন্দ আপন মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত, তাহার কোন ভালমন্দের বিচার নাই, উপকার অপকারের বিচার নাই। কোন লৌকিক কৈফিয়তের গণ্ডির মধ্যে তাহাকে টানা যায় না। কিন্তু সকল অনুভূতিকেই আমরা বাহ্যবস্তুর মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলি না বা তুলা উচিতও মনে করি না। বাহ্য বস্তুর মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার কথা উঠিলেই আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শ্রোতা ও দর্শকের মনোভাব প্রভৃতি নানা বাহ্য বিষয়ের বিচার করিতে হয়, কাজেই সেখানে ঔচিত্য অনৌচিত্যের কথা ওঠে, ভালমন্দের কথা ওঠে, উপকার অপকারের কথা ওঠে। সেইজন্য ক্রোচে বলিয়াছেন,

"Therefore when you have formed an intuition, it remains to decide whether or no we should communicate it to others and to whom and when and how ; all of which considerations fall under the utilitarian and ethical criterion."

যখন বীক্ষা শক্তির বিকাশে একটী অনুভূতি অন্তরের মধ্যে প্রকাশ লাভ করে ও সেই প্রকাশ যখন ধ্বন্যাত্মক শব্দসঞ্চয়ের মধ্যে কিংবা বাহ্যিক বর্ণসঞ্চয়ের মধ্যে বাহ্যীকৃত হইয়া রূপায়ণ বস্তুরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন যাহারা তাহা দেখিয়া আনন্দ লাভ করে, তাহারাই সেই রূপায়ণিক বাহ্য সঙ্কেতের মধ্য দিয়া আপনাদিগকে কবির অন্তরানুভূতির সহিত এক করিয়া তুলে। যখন একই রূপায়ণ বস্তুকে কেহ বা সুন্দর বলে কেহ বা কুৎসিত বলে এবং একই বস্তুর সৌন্দর্য্যবিচারে নানা বিভিন্ন মত উৎপন্ন হয়, তাহার প্রধান কারণই এই যে, ব্যক্তিগত নানা ধারণা, নানা বিষয়ের নানা প্রকার উত্তেজনা, নানা বিষয়ের নানা প্রকার আসক্তি আসিয়া প্রমাতাকে এমনই সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলে যে, তাহার ফলে তাহার চিত্তের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতা উদ্বুদ্ধ হইতে পারে না। নচেৎ কবি বা চিত্রীর মধ্যে যে বীক্ষাশক্তি রহিয়াছে, শ্রোতা, পাঠক বা দর্শকের মধ্যেও অল্প পরিমাণে হইলেও তদনুরূপই বীক্ষাশক্তি কাজ করিতেছে। সেই শক্তির স্বচ্ছন্দতার মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া পাঠক বা দর্শক যখন আপনার প্রাকৃত ব্যক্তিগত জীবনের নানাবিধ ধারণার কুহেলিকাজাল ছিন্ন করে, নানা প্রকার বাসনা ও আসক্তির

দ্বারা নিজের চারিদিকে যে সঙ্কীর্ণ বন্ধন রচনা করিয়াছে তাহাকে অপসারিত করে, সেই মুহূর্ত্তে রসবিদ্রুতিতে বিগলিত-প্রমাতৃস্বভাব হইয়া কবি-চিত্তের অনুভূতির সহিত আপনাকে এক ও অভিন্ন করিয়া তুলে। কবি বা চিত্রীর মধ্যে একটা ব্যক্তিগত প্রাকৃতিক জীবন আছে। কবি তাঁহার রূপায়ণের মধ্যে তাঁহার প্রাকৃতিক জীবনকে বিসর্জ্জন দিয়া একটী রূপায়নিক বীক্ষার মধ্যে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করেন। পাঠকও তেমনি রূপায়ণ-বস্তুর সঙ্কেতের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া আপন বীক্ষা-শক্তির ব্যাপারের দ্বারা কবির সে অলৌকিক অনুভূতির সহিত আপনাকে একেবারে অভিন্ন করিয়া দেখেন। যে পরিমাণে এই কার্য্যটী সফল হয় সেই পরিমাণেই কবি বা চিত্রীর রূপায়ণকে আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। সেইজন্য ক্রোচে বলিয়াছেন, "In order to judge Dante we must raise ourselves to his level : let it be well understood that empirically we are Dante, nor Dante we ; but in that moment of judgment and contemplätion our spirit is one with that of the poet and in that moment we and he are one single thing. In this identity alone resides the possibility that our little soul can unite with the great souls and become great with them in the universaiity of the spirit." কবি যেমন তাঁহার অনুভূতিটীকে তাঁহার উপযুক্ত শব্দের মধ্যে প্রকাশ করিবার জন্য হয়ত অনেকবার বিফলকাম হইয়া যখন ঠিক যথার্থ শব্দটীকে

খুঁজিয়া পান, তখন অনুভূতির যথানুরূপ প্রকাশের জন্য আনন্দিত হইয়া উঠেন, পাঠকও তেমনি কবির অনুভূতির মধ্যে যখন একবার প্রবেশ করিতে পারিয়া তাঁহার সহিত আপনাকে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে এক করিয়া দেখিতে পারেন তখন আনন্দে বিভোর হইয়া উঠেন। আনন্দ মাত্রকেই সৌন্দর্য্যের স্বরূপ বলা যায় না, অনুভূতির যথার্থ আত্মপ্রকাশেই সৌন্দর্য্য এবং এই অনুভূতির যথার্থ আত্মপ্রকাশের যে রসোপলব্ধি, বীক্ষাশক্তির স্বকীয় ব্যাপারের সার্থকতার যে রস, তাহাকেই সৌন্দর্য্যের রস বলা যায়। তাহাকেই বলা যায় রূপায়ণের আনন্দ।

বীক্ষাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—এই দুইটীই চিৎপুরুষের দুইটী স্বতন্ত্র-শক্তি। কিন্তু বীক্ষাশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াশক্তিরও পরিচালনা সঙ্ঘটিত হয়, এই ক্রিয়াশক্তিই আবার একদিকে বাহ্য শব্দে, রূপে বা রেখায় আপনাকে পরিণত করে। ক্রোচে কোন বাহ্যবস্তুতে বিশ্বাস করেন না, তথাপি তাঁহাকে বাহ্যীকরণ (externalisation) বা বাহ্য রূপ রেখা শব্দাদির কথা এইজন্যই বলিতে হয় যে, তাহা না হইলে বক্তব্য কথা প্রকাশ করিয়া উঠা দুর্ঘট হয় ; বাহ্য বলিয়া আমরা যাহা মনে করি তাহা আমাদের মধ্যে একটী বিকল্পব্যাপারের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সে আলোচনা এস্থলে প্রাসঙ্গিক নহে। বীক্ষাশক্তির আত্মপ্রকাশ বলিলে অন্তরাত্ম-প্রকাশকেই বুঝা যায়। কিন্তু যথার্থভাবে দেখিতে গেলে ইহাদের কোনটীকেই বীক্ষা-শক্তির আত্মপ্রকাশ বলিয়া বলা যায় না। বীক্ষা-শক্তিব্যাপার বিশ্লেষণ করিতে গেলে আমরা প্রথম পাই একটা নির্ব্বিকল্প রূপ বা উপলব্ধি (impression), তারপর পাই তাহার আন্তর

প্রকাশ এবং ইহার ফলে উৎপন্ন হয় রসবোধ, তারপর এই আন্তর ব্যাপারটীকে বহিরঙ্গ শব্দে বা বর্ণে পরিবর্ত্তিত করিবার ব্যাপার। ইহার মধ্যে যথার্থ চিন্ময় ব্যাপারটী হইতেছে আন্তর প্রকাশ এবং সেইটীই একমাত্র সত্য। ক্রমপরম্পরায় বীক্ষাশক্তির ব্যাপার আমাদের মধ্যে চলিয়াছে এবং রূপায়ণিক নূতন নূতন সৃষ্টি চলিয়াছে এবং প্রত্যেক সৃষ্টির পশ্চাতে প্রাচীন সৃষ্টিগুলি হয় স্মৃতিদ্বারা বিধৃত হইয়া কার্য্য করিতেছে, নয় বিস্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া গিয়া নবতর সৃষ্টিকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে। যখন কোন আন্তর অনুভূতিকে বাহ্যিক রূপায়ণিক সঙ্কেতের দ্বারা আমরা স্থায়ী করিয়া রাখিতে চেষ্টা করি তখন সেই স্থায়ী রূপায়ণবস্তুটী বাহ্য উপাদানরূপে শ্রোতা বা দ্রষ্টার মধ্যে যে বিকার সম্পাদন করে, তাহা নানা প্রাকৃতিক রূপ বা ধ্বনির মধ্য দিয়া শ্রোতা বা দর্শকের চিত্তের মধ্যে আবার বীক্ষানুভূতির সৃষ্টি করে ও তাহা হইতে পুনরায় রসধারা প্রবাহিত হয়। এমনি করিয়া রূপকার (artist) এবং তাঁহার শ্রোতা ও পাঠকের মধ্যে নিরন্তর আদান-প্রদান চলিতে থাকে। যখন আমরা কোন বাহ্যিক রূপায়ণিক বস্তুকে সুন্দর বলি, তখন 'সুন্দর' শব্দটীকে আমরা মুখ্য অর্থে ব্যবহার করি না। বাহ্য-রূপায়ণবস্তু বা প্রকৃতির তরুগুল্ম, লতাকুঞ্জ, নদনদী, গিরিকান্তার, নক্ষত্রখচিত আকাশমণ্ডল, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সাগরসৈকত—ইহাদের কাহাকেও মুখ্যভাবে 'সুন্দর' বলা যায় না। প্রাকৃতিক বস্তুমাত্রেই জড় এবং আমাদের আত্মার সহিত বিচ্ছিন্ন। সৌন্দর্য্য আমাদের বীক্ষা-শক্তির আত্মবিকাশের উপলব্ধি। কাজেই বাহ্যবস্তুর মধ্যে কোন

সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে না। যখন কোন বাহ্যবস্তু আমাদের মনের মধ্যে বীক্ষাশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলে, তখন সেই বীক্ষাশক্তির জাগরণের ফলে আমাদের মধ্যে যে নূতন নূতন অনুভূতির সৃষ্টি হয়, তাহারই আত্মপ্রকাশে আমাদের মধ্যে যে 'সুন্দরে'র অনুভব ঘটে, তাহাকেই বাহ্যবস্তুতে আরোপ করিয়া আমরা বাহ্যবস্তুকে 'সুন্দর' বলিয়া থাকি। কোন কাব্যও সুন্দর নহে, কোন চিত্রও সুন্দর নহে। এই নানা ফলপুষ্পধারিণী প্রকৃতি সুন্দরী নহে। সৌন্দর্য্য আমাদের আত্মার ধর্ম্ম, আত্মার সম্বন্ধ। সৌন্দর্য্যের যে আনন্দ, তাহাও বাহ্য-রূপায়ণের আনন্দ নয় বা বাহ্য প্রকৃতির আনন্দ নয়, তাহা আমাদের আত্মানুভূতির স্বপ্রকাশের আনন্দ। ক্রোচে বিষয়ানুভূতি বা ভাবানুভূতিমাত্রকেই সেই বিষয় বা ভাবের আত্মপ্রকাশের সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ intuition এবং expression অভিন্ন বলিয়া বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেটাকে অনুভূতি বলিয়াছেন, সেটা চিৎপুরুষের বীক্ষাত্মক একটা সৃষ্টি বা রচনা অর্থাৎ aesthetic synthesis; এই বীক্ষাত্মক ব্যাপার একটা সংবেদন ব্যাপার এবং ইহার ফলে চিৎপুরুষেরই অন্তরঙ্গ একটা পরিবর্ত্তন ঘটে। সেইজন্য এই intuition বা অনুভূতিকে ক্রোচে আত্মারই অবস্থাবিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আত্মারই অবস্থাবিশেষ বলিয়া অনুভূতিমাত্রই প্রকাশস্বভাব। এইজন্যই অনুভূতি ও প্রকাশ অভিন্ন। বীক্ষাশক্তিতে (aesthetic activity) চিৎপুরুষের প্রথম প্রকাশ। কিন্তু চিৎপুরুষের একশক্তির সহিত অপর শক্তির পার্থক্য আছে, কিন্তু কোন দ্বন্দ্ব নাই।

তাহারা পৃথক (distinct), অথচ বিরুদ্ধ বা opposite নহে। সেইজন্যই বীক্ষাশক্তির মধ্যে গর্ভিত হইয়া অন্বীক্ষাশক্তি কাজ করিতেছে এবং তাহার মধ্যে গর্ভিত হইয়া ক্রিয়াশক্তি আপনাকে ইচ্ছা ও ক্রিয়ার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতেছে। বীক্ষাশক্তির ব্যাপার অন্বীক্ষা ও ক্রিয়াশক্তিকে অপেক্ষা না করিয়াও চলিতে পারে। কিন্তু অন্বীক্ষা ও ক্রিয়াশক্তির ব্যাপার বীক্ষাশক্তির ব্যাপারকে অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না। সেইজন্যই অনেক সময় দেখা যায় যে, আমাদের অনেক মানসিক ব্যাপারের মধ্যেই এই চারিটী শক্তি অবিরোধে পরস্পরের সহযোগে কাজ করিতেছে। কিন্তু এই বিভিন্ন জাতীয় বৃত্তির সংমিশ্রণ সত্ত্বেও কোন মানসিক ব্যাপারকে সেই পরিমাণেই বীক্ষামূলক বলা যায়, যে পরিমাণে সেটুকু কেবলমাত্র রূপানুভূতি। এই বীক্ষাশক্তির ব্যাপার চিৎপুরুষের প্রথম ব্যাপার বলিয়াই ইহা একান্তভাবে অন্য-নিরপেক্ষ ও স্বাধীন, সেইজন্য রূপায়ণ বা art-কে কোন হিসাবেই অন্যসাপেক্ষ বলিয়া বলা যায় না। সেই জন্যই রূপায়ণকে বিচার করিতে হইলে তাহা দ্বারা কি পরিমাণ মঙ্গল সাধিত হইল, তাহা দ্বারা নীতিমার্গে চলিবার আমরা কি সুযোগ লাভ করিলাম, ইহার কোনও আলোচনা একান্ত অনাবশ্যক।

মেঘদূত ও কালিদাস

তর্কশাস্ত্রের গ্রন্থ খুলিলেই এই দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, Man is a rational animal অর্থাৎ ইতর প্রাণীর সহিত মানুষের এই পার্থক্য যে, মানুষ চিন্তা করে। ক্ষুধার তাড়নায় ইতরপ্রাণীরা আহারের অন্বেষণে ছুটে, ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করে; মানুষও তেমনি আহারের অন্বেষণে চারিদিকে ধাবিত হয় ও ভয়ের কারণ দেখিলে পলায়ন করে। এ সম্বন্ধে ইতরপ্রাণীর সহিত মানুষের কোন পার্থক্য নাই, কারণ মানুষ্ও পশু। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, 'পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ'। আজকালকার Behaviouristরা ইহা অপেক্ষা আরও একটু অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মানুষ কেবলমাত্রই পশু, আর কিছুই নয়। রূপরসাদির কারণীভূত পারিপার্শ্বিক জগতের বিবিধ হেতুপরম্পরার অভিঘাতে ও বিক্ষোভে বহির্জগতেরই অঙ্গীভূত দেহযন্ত্রের মধ্যে যে বিবিধ বিক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, তাহারই ফলে মানুষের দেহে যে যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা দ্বারাই মানুষের সকল কার্য্য ও সকল চেষ্টা ব্যাখ্যা করা যায়। এ সম্বন্ধে কোন জটিল তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার এখন কোন অবসর নাই। পশুর চিত্ত আছে কি না, পশু চিন্তা করে কি না, করিলে সে চিন্তা কিরূপ, সে আলোচনা এখন করিব না। তবে মানুষের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ

দেখিতে পাই যে, বর্ত্তমান ক্ষুৎপিপাসা ভয়ক্রোধ প্রভৃতি সামগ্রীকে অতিক্রম করিয়া সে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জগৎকে তাহার চিত্তবিতানের মধ্যে এমন করিয়া ধরিয়া রাখে যে, তাহার অন্তরের মধ্যে একটী অদ্ভুত চৈত্তিক জগৎ গড়িয়া উঠিতে থাকে। রূপময় জগৎ মানুষের মধ্যে আসিয়া মনোময় ও ভাবময় হইয়া উঠে। বাহিরের রূপময় জগতে যেমন নানা শক্তির বিবিধ সংঘটন একটা দুর্জ্ঞেয় অলঙ্ঘ্য নিয়মে নিষ্পাদিত হয়, বহির্জগতের মধ্যেও বুদ্ধির ভূমিতে নাম বা শব্দকে আশ্রয় করিয়া যে চিন্তা ও যুক্তির লীলা চলিয়াছে, তাহার অন্তরালেও প্রচ্ছন্নভাবে তেমনি একটা নিয়ম-শক্তি কাজ করিতেছে। যখন কোন দার্শনিক বা গাণিতিক মননক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকেন, তখন তাঁহার সেই মননস্রোতের মধ্যে যে ভাবগুলি পরস্পর গ্রথিত হইয়া সুসংশ্লিষ্টভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহার অন্তরালেও একটি দুর্জ্ঞেয় শক্তি কাজ করে। কেমন করিয়া একটি সিদ্ধান্ত হইতে মানুষ অপর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় ও সেই সিদ্ধান্ত হইতে অপর একটি সিদ্ধান্তে ও তাহা হইতে অপর একটি সিদ্ধান্তে, এমনি করিয়া একটি যুক্তিপরম্পরার মধ্য দিয়া মানুষের চিত্ত স্রোতের শৈবালের ন্যায় নীত হইতে থাকে, তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা অত্যন্ত কঠিন। কি ক্রমে, কি ধারায় একটি চিন্তা হইতে অপর চিন্তা, একটি সিদ্ধান্ত হইতে অপর সিদ্ধান্তে আমাদের চিত্ত নীত হইতে থাকে, তাহার ক্রম, তাহার লক্ষণ, তাহার ধর্ম্ম, আমরা যে শাস্ত্র দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহাকে বলে ন্যায়-শাস্ত্র। ন্যায়-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ

হইতেছে "নীয়ন্তে এভিঃ ইতি ন্যায়াঃ",—অর্থাৎ এই এই ক্রমে চিত্ত নীত হয়। ন্যায়-শাস্ত্র বা Logic সেই জন্য যুক্তির গতি, ক্রম, ছন্দ ও লক্ষণ আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু চিত্তের মধ্যে যে নিগূঢ় শক্তি আপনি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আপন গতি-ভঙ্গীর নানা লীলায় অপনাকে প্রকাশ করে, নিজে শয়ান থাকিয়া সর্ব্বত্র গমন করে, সেই শক্তির যথার্থ রূপকে আমরা কিছুতেই সাক্ষাৎ করিতে পারি না। সেই শক্তি সমস্ত বিশ্বের রহস্যকে আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। অথচ ধ্যানে বা ধারণায় তাহাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। কোন নৈয়ায়িক হয়ত বলিতে পারেন যে, Laws of Identity and Contradiction—ইহার মধ্যেই সমস্ত ন্যায়শাস্ত্রের জটিলত্ব নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু সমস্ত ন্যায়শাস্ত্র একটা জীবনহীন কাঠাম মাত্র, কিংবা নদীপ্রবাহের একটা খাত মাত্র। সেই কাঠামকে যাহা মূর্ত্তিময় করিয়াছে, প্রাণময় করিয়াছে, কিংবা সেই খাতকে যাহা বিমল জল-ধারায় প্রবাহিত রাখিয়াছে, ন্যায়শাস্ত্র দ্বারা তাহাকে পাওয়া যায় না। ভূগর্ভস্থ জলরাশি যখন আপনার মধ্যে আপনাকে সন্ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না, তখন সে প্রস্তররাশি বিদীর্ণ করিয়া সমতলভূমিকে আপন গতিভঙ্গীতে বিদ্রুত করিয়া আপন পথ আপনি কাটিয়া লয়, কোন খালকাটা ইঞ্জিনিয়ারের অপেক্ষা রাখে না। চিন্তার ধারা তেমনি তাহার আপন ন্যায়-পথকে আপনি গঠন করিয়া লয়। কিন্তু সেই জলে পানাবগাহন করিয়া আমাদের দেহমনকে যতই আমরা নিরন্তর স্নিগ্ধ ও পবিত্র করি না কেন, হৃদয়গুহানিবাসিনী সেই পুরাতনী

'গহ্বরেষ্ঠা' মাতা সরস্বতীকে তাঁহার আত্মস্থ ও প্রাণপ্রস্রবিণীরূপে আমরা কিছুতেই প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।

চিন্তা ও জ্ঞানধারার যেমন একটা ন্যায় আছে, কাব্যেরও তেমনি একটা ন্যায় আছে। তাহাকে বলা যায় Logic of Poetry। কবির হৃদয়পদ্ম যখন একটি মধুময় অনুভবে ও উপলব্ধিতে বিকসিত হইয়া উঠে, তখন সেই উপলব্ধির আত্মোন্মাদনায় আসে ভাষা, আসে ছন্দ, আসে শব্দসঞ্চয়ন, আসে শব্দের বিন্যাস। আর তাহাদের পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া কবির হৃদয়বাসিনী দেবী অতীতকে বর্ত্তমানে, বর্ত্তমানকে অতীতে ও অতীত-বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতে, অন্তরকে বাহিরে ও বাহিরকে অন্তরে যুগপৎ গ্রহণ করিয়া একটি আনন্দের ঐক্যের মধ্যে তাহাদের সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলেন। কোন কোন সমালোচক বলেন যে, অপরোক্ষ অনুভূতি বা Intuition কাব্যের প্রাণ। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, এই অপরোক্ষ অনুভূতি বা Intuition-এর পিছনে এমন একটি অমূর্ত্ত উপলব্ধি, এমন একটি হৃদয়ের অনির্ব্বচনীয় দ্রবভাব আছে, যাহা কবিচিত্তের অন্তরালে থাকিয়া তাহার সমস্ত মূর্ত্ত কল্পনা—তাহার ভাষা, শব্দ, ছন্দ ও বাক্যভঙ্গীকে সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সেই জন্যই দেখা যায় যে, অনেক সময়ে কবি যে মূর্ত্তি কল্পনা লইয়া কাব্য লিখিতে বসেন, কাব্য-লেখার অবসানে সে মূর্ত্তি এতই রূপান্তরিত হয় যে, কবি নিজেই হয়ত তাহাকে চিনিতে পারেন না। কাব্যদেবী যাহা দ্বারা নীত হন, তাহাই কাব্যের ন্যায় বা বাহন। সেই হিসাবে কাব্যের শব্দ, ছন্দ, উপমা প্রভৃতিও যেমন বাহন, যে কল্পনাটিকে কবি রূপ দিতে চান,

সেটিকেও তেমনি কাব্যসরস্বতীরই একরূপ বাহন বলা যাইতে পারে। কাব্যসরস্বতী যখন কবিচিত্তে প্রথম আবির্ভূতা হন, তখন তাঁহার প্রথম স্পর্শ পাওয়া যায় হৃদয়ের একটি গভীর উচ্ছ্বাসে। সে উচ্ছ্বাসের উপলব্ধি যখন আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়, তখন তাহার সামগ্রী-স্বরূপে আসে নানা দুঃখশোকের অনুভব, নানা কল্পনা, শব্দসঞ্চয়ন, ছন্দ। ভূগর্ভস্থ নির্ঝর যেমন আপন বেগে তার সমস্ত কঠিন আবরণকে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করিয়া আপনাকে প্রকাশের উপযোগী করিয়া তাহাদের সাহায্যে আপনার পথ করিয়া লয়, কবিচিত্তের মধ্যে যখন তেমনি সারস্বত উচ্ছ্বাসের আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন সমস্ত কবিচিত্ত মথিত হইয়া মূর্ত্ত কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া ভাষা ও ছন্দের মন্থর গতিতে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

"একি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে,
বলিতে দিতেছ কই ?

অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই,
কোথা ভেসে যাই দূরে।" (অন্তর্যামী)

"ও হে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস
আসি' অন্তরে মম ?

দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি' বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম ॥

কত যে বরণ কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি রচন
বাসর-শয়ন তব।

গলায়ে গলায়ে বাসনার সোণা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মূরতি নিত্যনব ॥" (জীবন-দেবতা)

তত্ত্বচিন্তা ও যুক্তিপ্রণালীর মধ্য দিয়া যেমন একটি দুর্জ্ঞেয় গভীর ধ্যানশক্তি আপনাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, কবির কাব্যের মধ্য দিয়াও তেমনি একটি গভীর উপলব্ধি, চিত্তের একটি অনির্ব্বাচ্য রসনির্ঝরিণী, তাহার সেই অলৌকিক রূপকে মূর্ত্ত কল্পনার সাহায্যে, শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। যিনি যন্ত্রী তিনি থাকেন অন্তরালে, আর তাঁহারই প্রেরণায় সমস্ত দুঃখ-সুখের তার লইয়া কবির চিত্ত-যন্ত্রটি ভাষা ও ছন্দের ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। মেঘদূতের মধ্যেও আমরা এই রকম একটি স্পর্শ বা তত্ত্বোপলব্ধির পরিচয় পাই। সেই উপলব্ধিটি যেন তা'র আপন আত্মপ্রকাশের নিবিড় বেদনায় ছন্দ ও শব্দ-বিন্যাসের মধ্য দিয়া একটি কবি-পরিকল্পনার আশ্রয় লইয়া আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মেঘদূতের যেটি উপখ্যান ভাগ সেটি গৌণ। কোন যক্ষ তার স্ত্রীর প্রতি প্রণয়ের আতিশয্যে তাহার কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, সেই জন্য তাহার প্রতি রামগিরি-পর্ব্বতে এক বৎসর প্রবাসদণ্ড-ভোগের আজ্ঞা হয়। সেই যক্ষ আট মাস বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিয়া আষাঢ় মাসের নবীন মেঘ দেখিয়া প্রিয়াবিরহে আকুল হইয়া উঠিল এবং সেই মেঘকে তাহার প্রিয়ার নিকট তাহার বার্ত্তা বহন করিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। প্রিয়া থাকেন অলকাপুরীতে। সেই অলকাপুরীর পথ মেঘ চেনে না, অতএব মেঘকে প্রথমতঃ অলকাপুরীর পথ বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই পথ বলিয়া দেওয়ার চেষ্টায় কবি পূর্ব্বমেঘ লিখিয়াছেন। উত্তরমেঘে অলকাপুরীর বর্ণনা ও যক্ষের প্রিয়া যক্ষের বিরহে কিরূপ উৎকণ্ঠিত

হইয়া কাল যাপন করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা এবং তাহাকে আশ্বাস দান। এই অলকাপুরীর পথ-বর্ণনাচ্ছলে কবির অনুভূতির যে দিক্‌টি আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারই ছন্দোবদ্ধ প্রকাশে পূর্ব্বমেঘের সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের শকুন্তলা ও কুমারসম্ভব কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রেমের প্রকৃতি সম্বন্ধে কালিদাসের অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভূতি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, রূপজ মোহে ও দৈহিক লালসার আরম্ভে প্রেমের যে কামমূর্ত্তির আমরা পরিচয় পাই, তাহা দুর্ব্বার, দুর্দ্দাম ও নিরঙ্কুশ বলিয়া দুর্ব্বাসার শাপবহ্নিতে কিংবা হরকোপানলে ভস্মীভূত হয়; কিন্তু তপস্যার আগুনে কিংবা দাবদহনে বিশোধিত ও সংস্কৃত হইয়া কামের যে প্রেমমূর্ত্তি আবির্ভূত হয়, তাহার সৌম্য সুন্দর শান্ত জ্যোতিতে সংসার মধুময়, কল্যাণময় হইয়া উঠে। সরোবরের গভীর তলদেশে নিবিড় পঙ্কের মধ্যে যে মৃণালখণ্ডের জন্ম হয়, তাহা গভীর জলের মধ্যে আপন নির্ব্বাত নিষ্কম্প সাধনায় জলরাশি ভেদ করিয়া যখন জলের উপরে উঠিয়া সূর্য্যরশ্মি হইতে আপন সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া সুষমায় ও কান্তিতে ফুটিয়া উঠে, তখন তাহাতে পঙ্কের অনুমাত্র লেপ থাকে না, তখন তাহা হয় সৌন্দর্য্যের সামগ্রী—পূজার সামগ্রী। কবি রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনের মধ্যেও আমরা প্রেমের এই গভীর রহস্যটীকে স্ফুট হইয়া উঠিতে দেখিতে পাই। "কড়ি ও কোমলে" কবি বলিতেছেন,—

"হৃদয় লুকানো আছে দেহের সাগরে
চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন,
সর্ব্বাঙ্গ ঢালিয়া আমি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহ মন চির রাত্রি দিন
তোমার সর্ব্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।"

তাহার পরেই দেখি যে কবি আর একস্তর উপরে উঠিয়াছেন—

"ওই দেহপানে চেয়ে, পড়ে মোর মনে
যেন কতশত পূর্ব্ব জনমের স্মৃতি!
সহস্র হারাণ 'সুখ আছে ও নয়নে
জন্ম-জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি!"

তাহার পরেই দেখি,

"ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে দাঁড়াও সরিয়া,
ম্লান করিয়ো না আর মলিন পরশে!
ওই দেখ তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া,
বাসনা নিশ্বাস তব গরল-বরষে!"

প্রেমের মধ্যে যে একটি 'Paradise Lost' এবং 'Paradise Regained'-এর সামঞ্জস্য রহিয়াছে, এ সত্যটি এত ব্যাপক যে, Shelley প্রভৃতি অন্যান্য কবি হইতেও ইহার দৃষ্টান্ত দেখান যায়। Epipsychidionএ বিরহতাপে দগ্ধ হইয়া Shelley প্রেমের যে

অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাহা কত গভীর, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

I know
That Love makes all things equal : I have heard
By mine own heart this joyous truth averred :
The spirit of the worm beneath the sod
In love and worship, blends itself with God.
True Love in this differs from gold and clay
That to divide is not to take away.
Love is, like understanding, that grows bright
Gazing on many truths ;

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মেঘদূত প্রবন্ধে মেঘদূতের মধ্যে যে একটি গভীর বিরহের আর্ত্তি আছে, তাহারই সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়ার বিরহটী সর্ব্বমানবের অন্তরস্থিত বিরহরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কবি লিখিতেছেন, "প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ! আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাই, সে আপনার মানস-সরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে। সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোন পথ নাই। আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়! মাঝখানে একেবারে অনন্ত, কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে! অনন্তের কেন্দ্রবর্ত্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ

কে লাভ করিবে! আজ কেবল ভাষায় ভাবে আভাসে ইঙ্গিতে ভুল-ভ্রান্তিতে আলো-আঁধারে দেহে মনে জন্ম-মৃত্যুর দ্রুততর স্রোতোবেগের মধ্যে তাহার একটুখানি বাতাস পাওয়া যায় মাত্র।" 'চৈতালী' ও 'মানসী'তেও কবি এই ভাবটিকেই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

"কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের কম্পনের ব্যথা ;
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্ত সৌন্দর্য্যেমাঝে একাকী জাগিয়া।"

মেঘদূতের মধ্যে যে আর একটি দিকের পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ তাহার কোন আভাস দেন নাই। কবির হৃদয়ের রসপ্লাবনে কবি নিজেই আমাদের চক্ষে 'কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠ' যক্ষ রূপে দেখা দিয়াছেন। বিরহের যে পুটপাকতপস্যায় প্রেমের যথার্থ রূপ স্ফুট হইয়া উঠে, যক্ষ তাহারই আবেশে মেঘের সন্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, আবেগে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। কূটজফুলের অর্ঘ্য লইয়া স্বাগত-প্রশ্নে স্নিগ্ধ প্রীতিতে মেঘকে সম্ভাষণ করিল।

"কোথা মেঘ—জল অনিল অনল ধূমসমষ্টিসার!
কোথা বা চেতন জীবের যোগ্য বার্ত্তাবহনভার!
মোহপরবশ পাশরি সে সব যক্ষ জলদে যাচে,
সচেতন কি বা অচেতন কিছু কামাতুর নাহি বাছে।"

কামার্ত্ত ব্যক্তি কামে অন্ধ হয়, তাই সে চেতনকে অচেতন মনে করে, অচেতনকে চেতন মনে করে। তাহার দৃষ্টি, তাহার বুদ্ধির লালসায় জড় হয়ে যায়; সেই জন্য মানুষের মধ্যে যে চিৎস্বরূপ আছে, তাহাকে অপমান করিয়া ধূলা ও কাদার মধ্যে টানিয়া আনে। কিন্তু যখন এই কামের মধ্য দিয়া প্রেম ফুটিয়া উঠে, তখনও তাহার নির্ম্মলজ্যোতিতে আর এক রূপে অচেতনও চেতন হইয়া ফুটিয়া উঠে। তাহার চক্ষুতে বিশ্বভুবন কেবলমাত্র জড়দ্রব্যের সংঘাত ও জড়শক্তির লীলাক্ষেত্ররূপে প্রতিভাত হয় না। সে আপনাকে প্রতিফলিত করিয়া তাহাদের মধ্যেও নিজেরই হাসিকান্নার লীলা প্রত্যক্ষ করে। জগতের পরিচয় তাহার কাছে বস্তুতান্ত্রিক Naturalism-এর মধ্য দিয়া নয়, জগতকে সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় পদার্থ রূপে দেখে না; সে দেখে তাহার মধ্যে প্রাণের লীলা, প্রাণের মিলন। যাহা কিছু কোমল, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু সুন্দর, তাহাই সে চক্ষু ভরিয়া জগত হইতে তুলিয়া লয় ও তাহা দিয়া সে চিত্তের মধ্যে যে ছবি আঁকিয়া তোলে, তাহার মধ্যেই তাহার জগতের পরিচয়। কালিদাসের চক্ষুতে প্রকৃতি যে জড় নয়, সে যে মানুষের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, মানুষের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, তার সঙ্গে যে মানুষ হৃদয়ের আদান প্রদান করিতে পারে, সৌহার্দ্দ করিতে পারে, তাহার পরিচয় কালিদাসের অন্য গ্রন্থেও পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথও এই তত্ত্বটি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শকুন্তলা-প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "লতার সহিত ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ, তপোবনের সহিত শকুন্তলার সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ। অভিজ্ঞানশকুন্তল-নাটকে

অনসূয়া প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবন-প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোন নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে প্রকৃতি রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য্য সাধন করাইয়া লওয়া—এ তো অন্যত্র দেখি নাই।" বনজ্যোৎস্নার প্রতি শকুন্তলার সোদর স্নেহ, সহকার পাদপের সহিত তাহার বিবাহ, আশ্রমমৃগের প্রতি শকুন্তলার সুকোমল বৎসলতা এবং শকুন্তলার বিদায়-কালে সমস্ত তপোবনভূমির হৃদয়ের বেদনা ও মঙ্গল আশীর্ব্বাদ—এই সমস্ত লইয়া শকুন্তলাকে যে ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে তাহাতে তপোবনকে কিছুতেই একটা জড় অরণ্য বলিয়া মনে করা যায় না। অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায়, অচ্ছিন্ন কিশলয়ের ন্যায়, শৈবালানুবিদ্ধ সরসিজের ন্যায় শকুন্তলা যেন একটি প্রস্ফুটিত কুসুম ; মহর্ষি কণ্ব যেন পিতা, আর শকুন্তলা যেন তপোবন-মায়ের কন্যা। চেতন অচেতনের বিভাগ দূরে সরিয়া গিয়াছে, তাই শকুন্তলার সহিত তপোবনের সাহজাত্যের যেন কোন হানি হয় নাই। তপোবনও যেন নাটকীয় একজন ব্যক্তি, অথচ কোন স্থূল রূপকের আশ্রয়ে একথাটি প্রকাশ করা হয় নাই। এই গভীর সত্যটি যেন দরদী কবির রসে আপনি সমুজ্জ্বল ও সুমধুর হইয়া উঠিয়াছে।

কুমারসম্ভবের নায়িকা পার্ব্বতী নগাধিরাজ হিমালয়ের কন্যা।

হিমালয়ের বর্ণনায় অনেক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা আছে, অথচ দেবতাত্মা নগাধিরাজের কন্যা বলিয়া পার্ব্বতীকে মনে করিতে মনে যেন কোথাও কোন অসামঞ্জস্যের বোধ হয় না। উদ্ভিন্ন-যৌবনা পার্ব্বতী যখন আপনার বিশ্ববিজয়ী রূপ লইয়া মহাদেবের যোগাশ্রমে সঞ্চরণ করিতেন, তখনও দেখি যে সমস্ত প্রকৃতি যেন পার্ব্বতীর নবযৌবনে যৌবনবতী হইয়া অকালবসন্তের বোধন করিয়া তাহার রূপ-সাধনার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। তারপর যখন রূপ-সাধনা ব্যর্থ হইল এবং পার্ব্বতী অধ্যাত্মতপস্যায় নিরত হইলেন, তখন তপোমূর্ত্তিতে প্রকৃতি তাঁহার সহায় হইলেন।

এই দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায় যে, কেবল মেঘদূতে নয়, শকুন্তলা ও কুমারসম্ভবেও অচেতন প্রকৃতি মানুষেরই সমপর্য্যায় হইয়া মানুষেরই সহযোগে তাহার সুখদুঃখের সহভাগিনী ও সঙ্গিনী হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই উভয়ের যোগের মধ্যে কোথাও কোন কষ্টকল্পনা নাই, রূপক নাই। একটা সহজসিদ্ধ সম্বন্ধ অনাবিল দরদে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু মেঘদূতে প্রকৃতি যেমন চেতন ও মনুষ্যধর্ম্মা হইয়া, মানুষের সকল প্রকার অনুভবের সহিত দরদী হইয়া আপন অনুভবের রেশ মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছে, এমন আর কোথাও দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, বিরহী যক্ষ যখন সন্তপ্ত হইয়া তাহার প্রিয়ার নিকট মেঘকে দূত প্রেরণ করিল, তখন সেই প্রেমের উৎকণ্ঠার মধ্যে ব্যগ্রতা থাকিলেও কোন ব্যস্ততার চিহ্ন দেখিতে পাই না। অলকাপুরীর অনুসন্ধানে

বাহির হইয়াও বিরহী যক্ষের চিত্ত ভারতবর্ষময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং যেখানে যাহা কিছু সুন্দর আছে, কোমল আছে, পবিত্র আছে, কল্যাণ আছে, তাহার মধ্য দিয়া সে তার প্রিয়াপ্রেমকে আকণ্ঠ পান করিতেছে। লালসার কামের মধ্যে দেহের একটা মাধ্যাকর্ষণ আছে, তাহাতে একটা দেহ আর একটা দেহকে টানিয়া আনে এবং সেই ভৌতিক মিলনে সে আকর্ষণের বিশ্রাম হয়। কিন্তু কাম যতই আপন তপস্যায় প্রেমে পরিণত হইতে থাকে, ততই দেখা যায় যে, সে শতধা সহস্রধা বিভক্ত হইয়াও আপনাকে শেষ করিতে পারে না। সেখানে দেহের মিলন হয় গৌণ, স্ত্রীপুরুষভাব হয় গৌণ, আকর্ষণই হয় প্রধান।

ন সো রমণ ন হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জনি॥

তাই কাম ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ, প্রেম বহুধাবিসারী—অনন্ত, অজস্র দানে ও অজস্র ব্যয়বাহুল্যে তাহার পূর্ণতার মধ্যে রিক্ততা আনা যায় না। এই কথাই লক্ষ্য করিয়া Shelley লিখিয়াছেন—

"True love in this differs form gold and clay
That to divide is not to take away."

শকুন্তলা যখন রূপজ আকর্ষণে আত্মবিস্মৃত, তখন তিনি অতিথির ডাক শুনিতে পাইলেন না, আশ্রমধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিল; কিন্তু দুষ্যন্ত যখন শকুন্তলার প্রেমে তন্ময়, মুহ্যমান, শোকে যখন রাজ্যের সমস্ত বন্ধ, ভয়ে যখন কেহ চূতমঞ্জরীর শাখা ছেদন করিতে পারে না, দেবতার আহ্বানে সেই মুহূর্ত্তেই তিনি রণযাত্রায় বহির্গত হইলেন, তাঁহার

ব্যক্তিগত শোক-বিরহের মধ্য দিয়া প্রেমের আস্বাদন তাঁহাকে কর্ত্তব্যের পথ হইতে, মঙ্গলের পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারিল না।

যক্ষের স্ত্রী অলকাপুরীতে বসিয়া দেহলীদত্ত পুষ্পের দ্বারা একটি করিয়া দিন গণিতেছিল, মিলনাতুর যক্ষ দীনক্ষীণ হইয়া কনকবলয়ভ্রংশ-রিক্তপ্রকোষ্ঠ হইয়াছিল ; তাহার প্রেমে গতি ছিল প্রচুর। অথচ সে গতি শুধু অলকাপুরীর আকর্ষণের টানে আপনার ব্যাপকতাকে খর্ব্ব করে নাই, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে যাহা কিছু মধুর দেখিয়াছে, তাহার আকর্ষণে সে ছুটিয়াছে এবং তাহার প্রত্যেকটি সম্ভোগের মধ্য দিয়া তাহার প্রিয়াপ্রেমের উপভোগ আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। নদী, শৈল, বৃক্ষ, কান্তার, অরণ্য সে গতির মুখে পড়িয়া আপনাদের জড়ত্বের আবরণ ছাড়িয়া দিয়াছে এবং সেই প্রেমের স্পর্শে আসিয়া তাহাদের প্রাকৃতিক Naturalistic ব্যাপারগুলি চেতনধর্ম্মী হইয়া নব নব মাধুর্য্য-পরম্পরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

কাপিল সাংখ্য বলে যে, প্রকৃতি জড়, সে পুরুষের ভোগাপবর্গসাধনের জন্য এক দিকে বুদ্ধি অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয় এবং অপরদিকে জড়জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহার পিছনে কোন স্বতন্ত্র ঈশ্বরশক্তি নাই। পাতঞ্জল সাংখ্য বলে যে, প্রকৃতি আপন শক্তিতেই পরিণত হয় বটে, কিন্তু জড় প্রকৃতি জানে না যে, কোন্ দিকের কিরূপ পরিণামের দ্বারা পুরুষের পুরুষার্থ সাধিত হইতে পারে। সেইজন্য যে উপায়ে কর্ম্মফল অনুসারে বিভিন্ন পুরুষের পুরুষার্থ সাধিত হইতে পারে, ঈশ্বরের নিত্য ইচ্ছা প্রকৃতির সেই সেই দিকের প্রতিবন্ধ অপসারিত করে এবং সেই

প্রতিবন্ধাপনয়নের দ্বারা পথ পাইয়া প্রকৃতি আপন স্বভাব গতিতে সেই সেই পথে ধাবিত হয় ও আপনাকে তদনুরূপে প্রবর্ত্তিত ও পরিণত করিতে থাকে। পুরাণে যে সাংখ্য পাওয়া যায়, তাহাতে প্রকৃতিকে ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, প্রকৃতি ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের শরীর-ভূতা এবং তাঁহারই ইচ্ছায় বিক্ষুব্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া নানা পরিণামের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। রামানুজ প্রভৃতির সাংখ্যও অনেকটা এইরূপ। কিন্তু কালিদাসের মত অন্যরূপ। তাঁহার মতে আত্মা স্বয়ং জগৎরূপে পরিণত হইয়া সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সাধন করিয়াছেন—

"নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্ সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।
গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদমুপেয়ুষে॥"

নদী, সমুদ্র, শৈল, কান্তার, অরণ্যানী ইন্দ্রিয়গ্রহণযোগ্য স্থূল ঘটাদি পদার্থ পরমাণু প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বস্তু, লঘু ও গুরু, কার্য্য ও কারণ—সমস্তই তাঁহার প্রকাশ।

"দ্রবঃ সঙ্ঘাতকঠিনঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মো লঘুর্গুরুঃ।
ব্যক্তো ব্যক্তেতরশ্চাসি প্রাকাম্যং তে বিভূতিষু॥"

তিনি পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনী প্রকৃতি, তিনিই উদাসীন পুরুষ; তিনিই হব্য এবং হোতা, ভোজ্য এবং ভোক্তা, বেদ্য এবং বেদিতা, ধ্যেয় এবং ধ্যাতা। প্রকৃতি এখানে পুরুষের বা ঈশ্বরের শক্তি নয়, প্রকৃতি এখানে মায়া নয়। চৈতন্য আপনি আপনাকে জগৎরূপে পরিণত করিয়াছে।

"জীবং পশ্যামি সর্ব্বত্র
অচৈতন্যং ন বিদ্যতে ॥"

শকুন্তলার নমস্কারশ্লোকের মধ্যেও শিব জগন্মূর্ত্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সূর্য্য, চন্দ্র, জল, আকাশ, বায়ু, পৃথিবী, হোতা এই নানা মূর্ত্তি লইয়াই শিবের প্রকাশ। 'বিক্রমোর্ব্বশী'তে কালিদাস বলিয়াছেন, —সেই পরমপুরুষ স্বর্গ ও পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, যোগীরা প্রাণবায়ুনিরোধের দ্বারা আপন অন্তরের মধ্যে তাঁহাকেই অন্বেষণ করেন ও ভক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা তাঁহারই সহিত সম্মিলিত হন। সাংখ্যদর্শনে পুরুষ প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের কূটতর্ক, বেদান্তদর্শনে ব্রহ্ম ও মায়ার সম্পর্ক বিচারের বাদ-কলহ কালিদাসকে বিক্ষুব্ধ করে নাই। তিনি ক্রান্তদর্শী, কবির দিব্য দৃষ্টিতে এক চৈতন্যস্বরূপের পরম বিকাশ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের কূট তর্ককে অতিক্রম করিয়া তাঁহার হৃদয় যে গভীর বিশ্বাসকে, যে সত্যানুভূতিকে আশ্রয় করিয়াছিল, রসের ভাষায় Logic of Poetryতে মন্দাক্রান্তা ছন্দের মৃদু মন্থর গুঞ্জরণে শাব্দী বীণার ঝঙ্কারে মেঘদূত কাব্যে তিনি তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ মেঘদূত কাব্যে কোন তত্ত্ববিচার নাই, কোন রূপক নাই, কোন প্রহেলিকার মায়াজাল নাই। ঐক্যমন্ত্রের সাধক বলিয়া তাঁহার চক্ষুতে কাম ও প্রেমের দ্বন্দ্ব জটিল হইয়া দাঁড়ায় নাই। কাম হইতে প্রেমে ও প্রেম হইতে কামে, অচেতন হইতে চেতনে ও চেতন হইতে অচেতনে তিনি নির্ব্বাধ ও নির্দ্বন্দ্ব পদসঞ্চারে গমনাগমন করিয়াছেন।

সন্তাপশরণ কামরূপী মেঘ বিরহী যক্ষের তাপপুঞ্জ লইয়া অলকাপুরীর পথে যাত্রা করিয়াছে। পথিকবধূরা অলকপ্রান্ত তুলিয়া এই ভাবিয়া নবীন মেঘের শোভা দেখিতেছে যে, বর্ষাকাল আসিয়াছে, কান্ত আগমনের আর দেরী নাই। চাতকেরা সঙ্গে সঙ্গে গান করিয়া চলিয়াছে, বলাকাপংক্তি গর্ভাধানের আশায় আকাশে মাল্য রচনা করিয়া মেঘের সংবর্দ্ধনা করিতেছে। মঞ্জু কলহংসী মৃণালখণ্ডের পাথেয় লইয়া অভিসারিকা হইয়াছে। রামগিরি উষ্ণ বাষ্পে গভীর বিরহ-ব্যথা প্রকাশ করিতেছে। চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া, গিরিতে গিরিতে বিশ্রাম লইয়া, ঝর্ণার জলে তৃষ্ণা হরণ করিয়া, সুরধনুর বিচিত্র বর্ণে শ্যাম কলেবরকে শিখিপুচ্ছমণ্ডিত করিয়া মন্থর গতিতে প্রবাসী বন্ধুর বার্ত্তাবহ হইয়া মেঘ চলিয়াছে। ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ পল্লীবধূরা বর্ষণের আশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহাদের বিশাল লোচনের দ্বারা তাহার দিকে চাহিয়া থাকিবে, তাহার স্পর্শে বনানীর দাবাগ্নি প্রশমিত হইবে, কৃতজ্ঞতায় উৎফুল্ল হইয়া আম্রকূট শৈল তাহাকে শীর্ষে ধারণ করিয়া রাখিবে, চারিদিকে পক্ক আম্রফলে পাণ্ডুকান্তি শৈলের উপর শ্যামকান্তি মেঘ যখন দাঁড়াইবে, তখন তাহাকে ধরণীমাতার স্তনের ন্যায় দেখাইবে এবং আকাশ হইতে অমরমিথুনেরা সে দৃশ্য পরস্পকে দেখাইবে। শবর-বধূদের মঞ্জুবিহারকুঞ্জে বিশ্রাম করিয়া বিন্ধ্যগিরির উপর দিয়া মেঘ চলিয়াছে, শীর্ণকায়া রেবা নদী বিন্ধ্যের পাদপ্রান্তে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে। আবার তৃষ্ণার্ত্ত হইলে বনগজমদের দ্বারা সুবাসিত বারি পান করিয়া, দ্রুতগতি পরিত্যাগ করিয়া ধীরমন্দ গমনে মেঘ উড়িয়া

চলিয়াছে, তাহার স্পর্শে বনানীর মধ্যে নীপকুসুমের শিহরণ জাগিয়াছে; কূটজকুসুমের সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হইয়াছে, সে সৌরভের আহ্বান, ময়ূরদের কেকাধ্বনির স্বাগত প্রশ্ন সে উপেক্ষা করিতে পারে না। মেঘ গিয়া উপস্থিত হইল দশার্ণ দেশে; সেখানকার উদ্যান-প্রাচীরগুলি পাণ্ডুবর্ণ কেতকী পুষ্পে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে, গ্রাম্য পক্ষীদের নীড়ে সমস্ত বৃক্ষগুলি পূর্ণ হইয়াছে, পক্ক জম্বুফলে বনান্ত শ্যাম হইয়া গিয়াছে। দশার্ণের রাজধানী বিদিশার বিলাসীদের সাহচর্য্যে মন চঞ্চল হইলে বেত্রবতীর সভ্রূভঙ্গ মুখসুধা কামনির্ঘোষে পান করিবে। বিদিশায় যখন মেঘ যাইবে, তখন একটু বাঁকা পথ হইলেও উজ্জয়িনীর সৌধসমাসীন লোলাপাঙ্গলোচনার কটাক্ষ দেখিয়া না গেলে চক্ষু সার্থক হইবে কি করিয়া? উজ্জয়িনীর কাছেই নির্ব্বিন্ধ্যা নদী হংসসারসের কাঞ্চীদাম পরিয়া তরঙ্গসঞ্চালনে তাহার ঘূর্ণাবর্ত্তের নাভিপদ্ম প্রদর্শন করিয়া মেঘকে যখন আহ্বান করিবে, তখন তাহার বিলাস-বিভঙ্গের মৌন আবেদন উপেক্ষা করা যায় না। মেঘের প্রেমধারার অভাবে সিন্ধু কৃশ ও ক্ষীণ হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। জলধারার অভিষেকে বিরহাতুরাকে নবীন স্বাস্থ্যে উপচিত করিয়া তোলাও মেঘের কর্ত্তব্য। তার পরই উজ্জয়িনী।

"যথায় উষার বিকচকমল-সৌরভ-মাখি অঙ্গে,
সারসদিগের পটু মদকল কূজন বিথারি রঙ্গে;
শিপ্রাপবন সুরতপিয়াসী চাটুকারী প্রিয়প্রায়
রমণীর রতিশ্রান্তি হরিছে সরসে পরশি গায়।"

"উপচিয়ো তনু জাল-বিগলিত কেশপ্রসাধন-ধূপে,
ভবনশিখীরা প্রীতি-উপহার আনিবে নৃত্যরূপে ;
কুসুমে বাসিত সুন্দরীপদ-যাবকে রচিত-কান্তি
সৌধের শোভা নিরখি তাহার নাশিয়ো পথের শ্রান্তি।"

তারপর সন্ধ্যাকালে মহাকালের মন্দিরে আরতিতে দেবদাসীদের নৃত্য, দেবদাসীদের চঞ্চল চরণের গতিভঙ্গীতে রসনাঝনৎকার ও তাহাদের চামরান্দোলনে চারুকঙ্কণের ক্বণৎকার, তাহা না শুনিলে আর উজ্জয়িনীতে গিয়া ফল কি! উজ্জয়িনীর অভিসারিকারা যখন রাত্রি-কালে প্রিয়গৃহের উদ্দেশে গমন করিবে, তখন সেই রুদ্ধালোকে সূচীভেদ্য অন্ধকারে নিমগ্ন নরগতিপথে সৌদামিনী ঝলকাইয়া মেঘ যেন পথ দেখাইয়া দেয়, কিন্তু গর্জ্জন বা বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ভীত ত্রস্ত না করে। এই বিদ্যুৎপ্রকাশে যদি বিদ্যুৎপত্নী ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তবে কোন উত্তুঙ্গ সৌধশিখরে রাত্রি যাপন করিয়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন বন্ধুকৃত্য সম্পাদন করিতে যাত্রা করেন। কিন্তু সূর্য্যের পথ যেন রুদ্ধ করিয়া না দাঁড়ান, কারণ সমস্ত নিশার বিরহে পদ্মিনীর অশ্রু মোচন করিবার জন্য সূর্য্য তখন ব্যগ্র হইয়া আসিতেছেন, তাঁহার পথ রোধ করিয়া তাঁহার কোপবৃদ্ধি করা তখন কিছুতেই উচিত হইবে না। পথে যাইতে গম্ভীরানদীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে, তাহার প্রসন্ন হৃদয়ের মধ্যে, হে মেঘ, তোমার প্রতিবিম্ব পড়িলে তাহার চটুলশফরীনয়নের কটাক্ষকে উপেক্ষা করা উচিত হইবে না। তারপর মেঘ দেবগিরিতে কার্ত্তিকের পূজা সারিয়া দশপুর নগরের রমণীগণের

নেত্র কৌতূহলের পাত্র হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত নগরে উপস্থিত হইবে; ব্রহ্মাবর্ত্তের প্রাচীন কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া কনখলের নিকট উপস্থিত হইবে। এই কনখলেই গঙ্গা অবতীর্ণ হইয়া সগরসন্তানগণের স্বর্গারোহণের সোপান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গঙ্গার উৎপত্তিস্থান অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের উচ্চশিখরে ভক্তিনম্র চিত্তে ভগবান্ অর্দ্ধেন্দুমৌলির চরণ দর্শন করিয়া বেণুরন্ধ্র সমুদ্‌গত বীণাতানের ঐক্যবাদনে কিন্নরীমুখনিঃসৃত ত্রিপুরবিজয়গীতি শ্রবণ করিয়া গুহাভ্যন্তরে মৃদুগর্জ্জনে মৃদঙ্গবাদ্যের অনুকরণ করিয়া হংসগণের মানস-সরোবরে যাইবার পথ ধরিয়া ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের রন্ধ্র দিয়া মহাদেবের পুঞ্জীভূত অট্টহাস্যের ন্যায় শোভমান শুভ্র কৈলাস পর্ব্বতের অতিথি হইবে। সেখানে পার্ব্বতী যদি পদব্রজে বিচরণ করিতে থাকেন, তবে তোমার অভ্যন্তরস্থ জলরাশিকে কঠিন করিয়া সোপানাবলির ন্যায় নিজেকে উন্নতাবনত করিয়া পার্ব্বতীমাতার মণিময় তটারোহণের সুবিধা করিয়া দিবে। সেখানে দেবরমণীগণের কঙ্কণপ্রহারে উদ্গীর্ণবারি হইয়া তাহাদের স্নান-গৃহের যন্ত্রধারা বর্ষণের কার্য্য সম্পাদন করিবে; তাঁহারা যদি ছাড়িয়া দিতে না চান, তবে সেই ক্রীড়ালোলা অবলাদিগকে শ্রবণ-ভীষণ গর্জ্জনের দ্বারা ভীত করাইয়া তাহাদের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া মানস সরোবরের জল পান করিয়া কল্পবৃক্ষের পল্লবগুলিকে বিকম্পিত করিয়া অলকার দ্বারদেশে উপনীত হইবে।

এই তো গেল পূর্ব্বমেঘের কথা। কালিদাসের মেঘদূতের কোন পূর্ব্বাস্বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। উত্তরমেঘে অলকা-

পুরীর বর্ণনা, যক্ষের গৃহের বর্ণনা, যক্ষপত্নীর রূপবর্ণনা, তার বিরহের বর্ণনা, তাহাকে আশ্বাস দান—এমনি করিয়া উত্তরমেঘের শেষ।

পূর্ব্বমেঘে কবি বহির্জগতের সম্মুখান হইয়া কবিহৃদয়ের অলৌকিক অধ্যাত্ম-যোগে নিজের মধ্যে বহির্জগৎকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সে সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ নহে, অন্বীক্ষামূলক তত্ত্বসাক্ষাৎকার নহে, সেটী রসের অধ্যাত্ম-সাক্ষাৎকার। কালিদাস যখন বহির্জগতের সম্মুখীন হইয়াছেন, তখন তাঁহার চক্ষুতে সে বহির্জগৎ বাহিরের হইয়া objective হইয়া দাঁড়ায় নাই। নদ, নদী, গিরি, কান্তারের তিনি কোন স্বভাব বর্ণনা দেন নাই। মালতীমাধবে যেমন দেখিতে পাই—

বানীরপ্রসবৈর্নিকুঞ্জসরিতামাসক্তবাসং পয়ঃ
পর্য্যন্তেষু চ যূথিকাসুমনসামুজ্জৃম্ভিতং জালকৈঃ।
উন্মীলৎকুটজপ্রহাসিষু গিরেরালম্ব্য সানূনিতঃ
প্রাগ্ভারেষু শিখণ্ডিতাণ্ডববিধৌ মেঘৈর্বিতানায্যতে॥

অথবা অভিনন্দের যেমন—

বিদ্যুদ্দীধিতিভেদভীষণতমঃস্তোমান্তরাঃ সন্তত-
শ্যামাম্ভোধররোধসঙ্কটবিয়দ্বিপ্রোষিতজ্যোতিষঃ।
খদ্যোতানুমিতোপকণ্ঠতরবঃ পুষ্ণন্তি গম্ভীরতা-
মাসারোদকমত্তকীটপটলীক্বাণোত্তরা রাত্রয়ঃ॥

কালিদাসের মেঘদূতে বা অন্যত্র এ জাতীয় বর্ণনার ব্যবহার অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি এখানে মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট,

মানুষের সহিত একপর্য্যায়ভুক্ত। মানুষ যেমন চেতন, প্রকৃতিও তেমনি চেতন, মানুষের যেমন সুখদুঃখ, সম্ভোগবিরহ, প্রকৃতির মধ্যেও তাই। বিক্রমোর্ব্বশীতে দেখিতে পাই উর্ব্বশী লতারূপে পরিণত হইয়াছেন আর রাজা পুরূরবা তাঁহার অনুসন্ধানে তরুগুল্ম, ময়ূর, কোকিল, হস্তী, নদ, নদী সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফিরিতেছেন যে, তাহারা তাঁহার উর্ব্বশীর কোন সংবাদ দিতে পারে কি না। গিরিনদী দেখিয়া বলিতেছেন, এই নূতন জলকলুষিত স্রোতোবহাকে দেখিয়া আমার রতিরসের উপলব্ধি হইতেছে। ভ্রূভঙ্গীতরঙ্গযুক্তা চঞ্চলবিহগশ্রেণীকাঞ্চীভূষণা স্খলিতবন্ধনবসনের ন্যায় ফেনবিশিষ্টা ও মধুরাস্ফুটশব্দশালিনী এই নদীকে দেখিয়া আমার মনে হয় যে, নিশ্চয়ই সেই কুপিতা প্রিয়তমা এই নদীরূপে পরিণতা হইয়াছে।

তরঙ্গভ্রূভঙ্গা ক্ষুভিতবিহগশ্রেণিরসনা
বিকর্ষন্তী ফেনং বসনমিব সংরম্ভশিথিলম্।
যথা জিহ্মং যাতি স্খলিতমভিসন্ধায় বহুশো
নদীভাবেনেয়ং ধ্রুবমসহমানা পরিণতা॥

কালিদাস কুমারসম্ভবে হিমালয় বর্ণনা করিতে গিয়া বলিলেন যে, হিমালয়ে হিম থাকিলেও রত্ন আছে প্রচুর। গৈরিক ভূমির প্রতিফলনে সেখানকার মেঘ দ্বিপ্রহরেও রক্তবর্ণ ধারণ করে এবং তাহাতে সেস্থানের বিলাসিনীদের মনে অসময়ে সন্ধ্যাভ্রম হওয়াতে তাহারা সান্ধ্য বেশভূষার আয়োজন করে। নিম্নদেশে বৃষ্টি হইলে বৃষ্টির দ্বারা উদ্বেজিত সিদ্ধেরা

মেঘের উপরে উঠিয়া রৌদ্রতাপ উপভোগ করে, সিংহ ও হস্তী সেখানে প্রচুর, কিন্তু গজমুক্তাও কম নয়। সেখানকার ভূর্জ্জপত্রে বিদ্যাধর-সুন্দরীরা প্রেমপত্র লিখিয়া থাকে, কীচকরন্ধ্রনির্গত বংশধ্বনিতে কিন্নরী-দের গীতবাদ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেখানকার ওষধি হইতে রজনীতেও আলোকরশ্মি নির্গত হয়। তাহাতে বনচরকামিনীদিগের নৈশপ্রিয় সমাগমে তৈলপ্রদীপের কার্য্য চলিয়া থাকে। সেখানে গিরিগহ্বরে যখন দম্পতিরা বিহারমত্ত হয়, তখন গুহাদ্বারে লম্বমান মেঘের তিরস্করিণীতে তাহাদের লজ্জানিবারণ করে। এই বর্ণনার মধ্যে হিমালয়ের গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য ও বৃহত্ত্বের পরিচয় পাই না। দেবতাত্মা হইলেও হিমালয় কালিদাসের চক্ষুতে মানুষের ভোগসম্ভোগের উপাদানমাত্র ; জড়প্রকৃতি কালিদাসের চক্ষুতে হয় চেতনবদ্ব্যবহারিণী নয় পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনী। প্রকৃতিকে স্বতন্ত্রভাবে তার আপন জড়মহিমায় কালিদাস কখনও প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখেন নাই। প্রকৃতিকে তার আপন মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া তাহার সহিত বন্ধুভাবে পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করা কালিদাসের রীতি নহে। কিন্তু ভবভূতির বর্ণনা দেখিলে পাওয়া যায় যে, তিনি প্রকৃতিকে তাঁহার আপন জড়ত্বের মধ্যে দেখিয়া তার গাম্ভীর্য্যকে স্বতন্ত্রভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাই উপভোগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

স্নিগ্ধশ্যামাঃ ক্বচিদপরতো ভীষণাভোগরুক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাম্।

এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদ্গর্ত্তকান্তারমিশ্রাঃ
সংদৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ ॥

কিংবা

নিষ্কূজস্তিমিতাঃ ক্বচিৎ ক্বচিদপি প্রোচ্চণ্ডসত্ত্বস্বনাঃ
স্বেচ্ছাসুপ্তগভীরভোগভুজগশ্বাসপ্রদীপ্তাগ্নয়ঃ।
সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিলসৎস্বল্পাম্ভসো যাস্বয়ং
তৃষ্যদ্ভিঃ প্রতিসূর্য্যকৈরজগরস্বেদদ্রবঃ পীয়তে ॥

ইহাকে বলে, 'জড়প্রকৃতিঃ স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতা' কিংবা Naturalistic Realism. ঋতুসংহারেও দেখিতে পাই যে, কবি সমস্ত ঋতুকে মানুষের উপভোগের দিক্ দিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। নির্ব্বিকার হইলেও ঋতুগুলি প্রাণীদিগের প্রাণভূত এবং সর্ব্বদা প্রাণীদিগের নানাবিধ উপভোগের সহায়ভূত।

"বহুগুণরমণীয়ঃ কামিনীচিত্তহারী
তরুবিটপিলতানাং বান্ধবো নির্বিকারঃ।
জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো
দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি।"

ভবভূতি যেখানে প্রার্থনা করেন যে, সকলে পাপ হইতে পরিত্রাণ পাউক ও পাপপরিত্রাত হইয়া সকলে মঙ্গল লাভ করুক,

পাপম্ভ্যশ্চ পুনাতু বর্দ্ধয়তু চ শ্রেয়াংসি সেয়ং কথা
মঙ্গল্যা চ মনোহরা চ জগতো মাতেব গঙ্গেব চ।

কিংবা, সন্তঃ সন্তু নিরন্তরং সুকৃতিনো বিধ্বস্তপাপোদয়াঃ,

কালিদাস সেখানে চান বাঞ্ছিতফলপ্রাপ্তি, ঐহিক সুখসম্ভোগ ও বিপদ্ হইতে ত্রাণ। সকল লোকে যাহাতে বিপদ্ হইতে উদ্ধার পায়, সকলের যাহাতে মঙ্গল হয়, সকলে যাহাতে নিজ নিজ কামনার বিষয় প্রাপ্ত হয়, সকলে যাহাতে সর্ব্বত্র আনন্দ লাভ করে।

সর্ব্বস্তরতু দুর্গাণি সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্ব্বঃ কামানবাপ্নোতু সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র নন্দতু॥

আমাদের দেশে প্রাচীন অধ্যাত্মশাস্ত্রে যে আত্মোপলব্ধির উপদেশ আছে, তাহাতে আত্মাকে জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইয়াছে। বেদান্তমতে জগৎ মিথ্যা মায়াপ্রপঞ্চ। জগৎপ্রপঞ্চের মধ্য দিয়া আমাদিগকে ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইতে হয়, কিন্তু এই জগৎপ্রপঞ্চের সহিত ব্যবহারের মধ্যে আমাদের প্রধান দৃষ্টিই হইতেছে, কি উপায়ে আমরা ইহার জটিল জাল হইতে মুক্তি পাইব, তাহার অনুসন্ধান। সাংখ্যমতে প্রকৃতি মিথ্যা নয়, কিন্তু প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ মিথ্যা এবং এই মিথ্যাবুদ্ধি হইতেই প্রকৃতি পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনী। এই মিথ্যা বুদ্ধির ধ্বংস করাই সাংখ্যযোগশাস্ত্রের উদ্দেশ্য এবং ইহাতে সিদ্ধ হইলে আমাদের বুদ্ধি ও মনের চরম ধ্বংস ও প্রকৃতির সহিত আমাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ সংঘটিত হইবে। এই জন্য যে বুদ্ধিতে প্রকৃতির দিকে আমরা ভোগের দৃষ্টিতে চাই, শাস্ত্র তাহাকে বর্জ্জন করিতে উপদেশ করেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যলীলা যে আমাদিগের আমিত্বকে পরিস্ফুট,

পবিত্র করিয়া আমাদের মধ্যে একটা উচ্চ অঙ্গের ভাবধারা খেলাইয়া একটা নবতর, কল্যাণতর সার্থকতার দিকে আমাদিগকে প্রণোদিত করিতে পারে, এ দৃষ্টি প্রাচীন ভারতবর্ষে একরূপ নাই বলিলেই হয়। প্রকৃতিকে হয় উপভোগ করিব, নয় প্রকৃতি হইতে মুখ ফিরাইয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় লইব, নয় বৈরাগ্য লইয়া প্রকৃতির সহিত ব্যবহার করিব।

এই সমস্ত বৃত্তি, বাসনা ও সংস্কারাদি লইয়া মানুষ হিসাবে যে যে বহুকোষাত্ম স্বতন্ত্র পুরুষ প্রাত্যহিক নানাবিধ উপলব্ধির মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে, তাহাকে একটা স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দেওয়া শুধু আমাদের দেশে ঘটিয়া উঠে নাই। ইংরেজীতে যে হিসাবে thought, will ও emotion-এর সমষ্টি লইয়া একটি সমষ্টিপুরুষের Individuality বা স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় চিন্তাধারায় তাহাকে সে মর্য্যাদা দেওয়া হয় নাই। মানুষের মধ্যে যে-চিৎ-স্বরূপ অবস্থিত আছেন, তাঁহার সহিত তাহার চিন্তা, ইচ্ছা প্রভৃতির কোন অন্তরঙ্গ গুপ্ত অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ নাই বলিয়া, মানুষের সমষ্টি-স্বরূপটির মহিমা ও তাৎপর্য্যের ইঙ্গিত আমাদের দেশের অধ্যাত্মসাহিত্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। সেই জন্য সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতিকে কেহ বা কেবল মাত্র জড়রূপে দেখিয়াছেন ও তাহার জড়স্বভাবের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন, কেহ বা শরীরিরূপে, বহিরঙ্গরূপে সম্পর্কিতভাবে বনদেবতা প্রভৃতির কল্পনা করিয়াছেন। আবার কেহ বা প্রকৃতিকে কেবলমাত্র মানুষের বাসনা ও কামনা উপভোগের সামগ্রীরূপে

দেখিয়াছেন; আবার কেহ বা প্রকৃতি ও মানুষ উভয়কেই এক চিৎস্বরূপের পরিণতি বলিয়া মনে করিয়াছেন। এবং সেই জন্য একদিকে যেমন প্রকৃতিকে চেতনের কামনা উপভোগের অনুকূলে প্রবর্ত্তিনী বলিয়া দেখিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি প্রকৃতিকে প্রাণময় রূপে দেখিয়াছেন এবং মানুষের মত প্রকৃতিও যেন নানাবিধ কামনা উপভোগে আসক্তা এইরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতি এবং মানুষ উভয়ে মিলিয়া আপন আপন ইচ্ছাসম্পূরণে যে মঙ্গলসাধন করিতেছেন, সেই ঐহিক নানাবিধ সুখসম্ভোগের মঙ্গলের মধ্যেই প্রকৃতি ও মানুষের একটা পরম সার্থকতা ও পরম মঙ্গল দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়াছেন। এইখানেই কালিদাসের বিশিষ্টতা।

আধুনিক কোন কোন ইংরেজ কবির মধ্যে আমরা প্রকৃতিসংস্পর্শের যে গভীর আনন্দসম্ভোগের পরিচয় পাই কালিদাসের মধ্যে প্রকৃতি-স্পর্শের আনন্দ সেরূপ পরিস্ফুট ও সুব্যক্ত হইয়া উঠে নাই। প্রকৃতির নানা চমৎকারিত্বে ও মনোহারিত্বে কালিদাসের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। নবপ্রবালোদ্গমচারুপত্রে নবচূতবাণে ভ্রমরপংক্তি দিয়া মন্মথ তাহার নাম লিখিয়াছেন, বালেন্দুর ন্যায় বক্র লোহিত পলাশফুল বনস্থলীর নখক্ষতের ন্যায় দেখাইতেছে, ভ্রমরের পংক্তিতে যেন বসন্তের তিলক আঁকিয়া দিয়াছে, চূতাঙ্কুরাস্বাদকষায়কণ্ঠ কোকিলের মধুর কূজনের শব্দে মন্মথের বাক্য শোনা যাইতেছে, ভ্রমর ভ্রমরীর সহিত এক কুসুমপাত্রে মধুপান করিতেছে, হরিণ হরিণীর গা চুলকাইয়া দিতেছে, করিণী করীকে পঙ্কজরেণুগন্ধি

জল পান করাইতেছে, চক্রবাক চক্রবাকীকে অর্দ্ধোপভুক্ত মৃণাল আহার করাইতেছে, পুষ্পস্তবকস্তনভারনম্রা লতাবধূরা শাখাবন্ধনে তরুদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে, এ বর্ণনার মাধুর্য্যে আমরা চৎমকৃত হই ; কিন্তু প্রকৃতির সংস্পর্শের এ হর্ষ, এ আনন্দ, এমন ব্যাকুল নয় যে, মানুষের অন্তরের অনুভূতির সমস্ত আনন্দের সাড়া যেন প্রকৃতির সহিত অবিভক্তভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। Wordsworth-এর কবিতা পড়িলে আমরা এই আনন্দের পরিচয় পাই। প্রকৃতি যেন Wordsworth-এর চক্ষে আনন্দে বিভোর এবং সে আনন্দের সঙ্গে Wordsworth-এর নিজের হৃদয়ের আনন্দ যেন একযোগে একতালে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে।

It was an April morning : fresh and clear
The Rivulet, delighting in its strength,
Ran with a young man's speed ; and yet the voice
Of waters which the winter had supplied
Was softened down into a vernal tune.
The spirit of enjoyment and desire,
And hopes and wishes, from all living things
Went circling, like a multitude of sounds.

এই কবিতাটি পড়িলে দেখা যায় যে, নরলোকের ও জড়লোকের সমস্ত আনন্দ যেন পুঞ্জীভূত হইয়া পরস্পরকে প্রকাশ করিতেছে।

কিন্তু শুধু তাহাই নয় Wordsworth-এর চক্ষুতে বহিঃপ্রকৃতির সংস্পর্শে তাহার লালনপালনে তাহার সাহায্যে তাহারই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মানুষের মধ্যে একটি অন্তঃপ্রকৃতি গড়িয়া উঠে। এই অন্তঃপ্রকৃতি যেন বাহিরের প্রকৃতির একটি প্রতিবিম্বস্বরূপ, অথচ বহিঃপ্রকৃতি নিরপেক্ষ হইয়া অজস্র রসে রূপে ভরপূর হইয়া, মানুষকে ক্রমশঃ প্রেমে, কোমলতায় ও জ্ঞানে নবতর, কল্যাণতর অভ্যুদয়ের দিকে লইয়া যায়, তাহার চক্ষে অন্ধজগতের মূঢ়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়।

These beautious forms,
Through a long absence, have not
been to me
As is a landscape to a blind man's
eye :
But oft, in lonely rooms, and' mid the
din
Of town and cities, I have owed to them
In hours of weariness, sensation sweet,
Felt in the blood, and felt along the heart ;
And passing even into my purer mind,
With tranquil restoration :—feelings too
Of unremembered pleasure : such, perhaps,
As have no slight or trivial influence
On that best portion of a goodman's life
His little, nameless, unremembered, acts
Of kindness and of love. Nor less, I trust,

To them I may have owed another gift,
Of aspect more sublime ; that blessed mood,
In which the burden of the mystery,
In which the heavy and weary weight
Of all this unintelligible world,
Is lightened :—that serene and blessed mood
In which the affections gently lead us on,—
Until, the breath of this corporeal frame.
And even the motion of our human blood
Almost suspended, we are laid asleep
In body, and become a living soul :

জন্মজন্মান্তরের পরিচয়ে প্রকৃতি যেন আমাদের অত্যাগসহন বন্ধু, বাল্যকালে ভাবস্থির জননান্তসৌহৃদের সেই ছায়া যেন হৃদয়ে অনুষক্ত হইয়া থাকে এবং তাহারই ফলে শৈশবে জগতের সহিত আনন্দনিবিড় সম্পর্ক যেমন গভীর তেমন আর অন্য কোন সময়ে নয়।

There was a time when meadow, grove and stream,
Tha earth, and every common sight,
To me did seem
Apparell'd in celestial light,
The glory and the freshness of a dream.

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রকৃতির সংস্পর্শের এই অজস্র ছলছল আনন্দ, হীন হইয়া আসে—

"At length the Man perceives it die away,
And fade into the light of common day."

তখন এই প্রকৃতিই আমাদের মধ্যে নিজেকে প্রতিবিম্বিত করিয়া আমাদের মধ্যে যে অমৃতের রসনির্ঝরিণী আছে, মঙ্গলের দিকে যে প্রেরণা আছে, পবিত্রতার দিকে যে জাগরণ আছে, শ্রেয়ের দিকে যে অভিযান আছে, তাহাকে সচেতন করিয়া তোলে এবং প্রকৃতির সসীম রূপের সহিত সংযোগ রাখিয়া অন্তরের গভীরতার মধ্যে যে অসীম অখণ্ড চিদাকাশ রহিয়াছে, প্রেমে স্নেহে তাহার মধ্যে চিত্তবিহঙ্গকে উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

But for those obstinate questionings
Of sense and outward things,
Fallings from us, vanishings ;
Blank misgivings of a Creature
Moving about in worlds not realized,
High instincts before which our mortal Nature
Did tremble like a guilty Thing surprised :
But for those first affections,
Those shadowy recollections,
Which, be they what they may,
Are yet the fountain-light of all our day,
Are yet a master-light of all our seeing ;

Wordsworth-এর দৃষ্টিতে প্রকৃতি মাতা, ভূত-ধাত্রী, বন্ধু, ভগিনী, গুরু, প্রিয়তমা পত্নী। একস্থানে তিনি বলিতেছেন

My dear, dear Sister ! and this prayer
I make,

Knowing that nature never never did betray
The heart that loved her ; 'tis her privilege,
Through all the years of this our life, to lead
From joy to joy : for she can so inform
The mind that is within us, so impress
With quietness and beauty, and so feed
With lofty thoughts, that neither evil tongues,
Rash judgments, nor the sneers of selfish men,
Nor greetings where no kindness is, nor all
The dreary intercourse of daily life,
Shall e'er prevail against us, or disturb
Our cheerful faith, that all which we behold
Is full of blessings.

প্রকৃতির সহিত মানুষের যেন একটা চিরপরিণয়ের লীলা চলিয়াছে। প্রকৃতির আলিঙ্গনের আহ্লাদে মানুষের অন্তরাত্মা যেন নিবিড় প্রসব-বেদনায় ব্যাকুল হইয়া প্রকৃতিরই অলৌকিক অমূর্ত্ত প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে এবং এই সৃষ্টিতেই কাব্যলক্ষ্মীর জন্ম।

"The life in the soul of man ceased and embraced in the soul of nature and in the passion of the embrace doubled his own life and doubled the life in nature till all the world and the individual man vibrated with the passion of a universal life."

"আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক্ না হারা।

জীবনজুড়ে লাগুক পরশ
ভুবন ব্যাপে জাগুক হরষ
তোমার রূপে মরুক ডুবে
আমার দুটী আঁখিতারা।”

Wordsworth-এর চক্ষুতে প্রকৃতি চেতনাময়, প্রাণময় আর সে প্রাণের সহিত মানুষের যে কেবল নিত্য আদান প্রদান চলিয়াছে তাহা নহে, কেবল আনন্দের মেলামেশা, কোলাকুলি চলিয়াছে তাহা নহে, সে আনন্দে মানুষের চিত্তবৃত্তির গভীরতম অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আলোড়িত হয়। আর সেই আলোড়নের ফলে মানুষের মধ্যে যাহা-কিছু কল্যাণতম আছে, যাহা-কিছু পবিত্রতম আছে তাহা বিকসিত হইয়া উঠে এবং মানুষ তাহার নিজের গভীরের মধ্যে, আত্মানন্দের মধ্যে তাহার নিভৃত অমৃতের সন্ধান পায়।

Keats-এর কবিতায় একদিকে দেখা যায় যেন তিনি স্বভাবের সৌন্দর্য্যে সমাধি লাভ করিয়া স্বভাবের উপলব্ধির মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, অপরদিকে দেখা যায় যে, প্রকৃতির শোভায় ও পক্ষি-কূজনের মনোহারিত্বে তাঁহার চিত্তের পাত্র যেন উচ্ছল ও বিহ্বল হইয়া গিয়াছে। আনন্দের আতিশয্য যেন তীব্র মদিরার ন্যায় তাঁহার সমস্ত দেহমনকে বিবশ ও নিস্পন্দ করিয়া দিয়াছে। প্রথমটির দৃষ্টান্তস্বরূপ Keats-এর “Autumn” নামক কবিতা হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিব,

Season of mists and mellow fruitfulness !
Close bosom-friend of the maturing sun ;
Conspiring with him how to load and bless
With fruit the vines that round the thatcheaves run
To bend with apples the moss'd cottage-trees,
And fill all fruit with ripeness to the core ;
To swell the gourd, and plump the hazel shells
With sweet kernel ; to set budding more,

অপরদিকের উদাহরণস্বরূপ তাঁহার "Ode to a Nightingale" নামক কবিতা হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি

My heart aches, and a drowsy numbness pains
My sense, as though of hemlock I had drunk,
Or emptied some dull opiate to the drains
One minute past, ane Lethe-wards had sunk !

... ...

Now more than ever seems it rich to die,
To cease upon the midnight with no pain,
While thou art pouring thy soul abroad
In such an ecstasy !
Still wouldst thou sing, and I have ears in vain,—
To thy high requiem become a sod.

Shelley-র মধ্যে দেখা যায় যে প্রকৃতির অন্তরালে অদৃশ্য অস্পৃশ্য ধ্যানগম্য যে একটি সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি প্রকৃতি ও মানুষের হৃদয়াসনে চঞ্চলচরণে নিরন্তর সঞ্চরণ করে তাহাকে পাইলেই জীবন সার্থক হয়, সত্য ও মঙ্গলে প্রতিষ্ঠা পায়,

Thy light alone, like mist o'er mountains driven,
Or music by the night-wind sent
Through strings of some still instrument,
Or moonlight on a midnight stream,
Gives grace and truth to life's unquiet dream.

Epipsychidionএর মধ্যেও Shelley প্রেমের মূর্ত্তির পূজা করিতে গিয়া এই মূর্ত্তিরই সাক্ষাৎ পাইয়াছেন,

In solitudes
Her voice came to me through the whispering woods,
And from the fountains, and the odours deep
Of flowers, which, like lips murmuring in their sleep
Of the sweet kisses which had lulled them there,
Breathed but of *her* to the enamoured air ;
And from the breezes whether low or loud,
And from the rain of every passing cloud,
And from the singing of the summer-birds,
And from all sounds, all silence.

Queen Mab-এর মধ্যেও তিনি প্রকৃতিকে শান্তি সামঞ্জস্য ও প্রেমের বাণী প্রচার করিতে শুনিয়াছেন। মানুষ প্রকৃতির এই বাণী না শুনিতে পাইয়া পাপ ও কলুষতার সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও তাহার তপোবনকুঞ্জের পরম শান্তিকে বিঘ্নিত করে—

The golden harvests spring ; the unfailing sun
Sheds light and life ; the fruits, the flowers, the trees,

Arise in due succession ; all things speak
Peace, harmony, and love. The Universe,
In Nature's silent eloquence, declares
That all fulfil the works of love and joy,—
All but the outcast, Man. He fabricates
The sword which stabs his peace ;

ফরাসী কবি Alfred De Vigny কিন্তু ঠিক উল্টাসুরেই গাহিয়াছেন যে, প্রকৃতি একান্ত জড় নিষ্ঠুর, তাহার কোন চেতনা নাই, মনুষ্য ও পিপীলিকা উভয়কে পিষিয়া ধ্বংস করে, মহারাজপ্রাসাদকে ধূলিসাৎ করে, তথাপি মানুষ ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে মাতা বলে আর প্রকৃতি তাহাদের সন্তানসন্ততিকে কালীকরালীরূপে নিরন্তর সংহার করেন।

'Je roule avec dédain, sans voir et sans entendre,
A côte des fourmis les populations ;
Je ne distingue pas leur terrier de leur cendre,
J' ignore en les portant les noms des nations.
On me dit une mère et je suis une tombe.
Mon hiver prend vos morts comme son hécatombe,
Mon printemps ne sent pas vos adorations.'

আমি হাসি উপহাসে
যারা যায় যারা আসে
এক হেরি সব
ক্ষুদ্র পিপীলিকা আর সমস্ত মানব।

জাতির গৌরব তোর নাহি শুনি আর
নব সৌধ হর্ম্ম্যতল
যত তোর শক্তি-বল
ভস্মরাশি সম পড়ি চরণে আমার।
নাহি দয়া নাহি ক্ষমা
কে আমারে বলিল মা
কোলে নিল স্থান ?
জানে না কি আমি তার ভীষণ শ্মশান !
গভীর শীতের রাতে
লক্ষ প্রাণ লয়ে হাতে
আমি দেই নিঃশব্দ আহুতি
তবু মোর মধু মাসে
যে নব বসন্ত হাসে
শোনে না সে তোমাদের স্তুতি।*

ফরাসী কবি Victor Hugo আবার A Villequier কবিতায় প্রকৃতির সম্মুখীন হইয়া বলিয়াছেন যে, রজতপ্রভা নদী, উদার মাঠ, অরণ্যানী, তুঙ্গগিরিশৃঙ্গ প্রভৃতির মধ্যে প্রকৃতির ভাগবতী মহিমা দেখিয়া আমার ক্ষুদ্রতাকে উপলব্ধি করিতে পারি, এই মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যের সম্মুখে

*(মৈত্রেয়ী দেবী কৃত অনুবাদ।)

দাঁড়াইয়া আমার চিৎস্বরূপে যে সাড়া লাগে তাহাতে তাহাকে যেন নবতরভাবে আমার মধ্যে ফিরিয়া পাই—

Maintenant qu'attendre per ces divins spectacles,
Plaines, forêts, rochers, vallons, fleuve argente',
Voyant ma petitesse et voyant vos miracles,
Je reprends ma raison devant l'immensite' ;

তিনি জানেন যে, আমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখান ছাড়াও প্রকৃতির অন্য কাজ আছে। মায়ের কোলে শিশুর প্রাণবিয়োগ হইলেও তাহার কিছু আসে যায় না, গাছের ফল বায়ুর তাড়নায় পড়িয়া যায়—ফুলের গন্ধ বাতাসে নিঃশেষ করিয়া লয়, কেহ না কেহ নিষ্পিষ্ট না হইলে জগন্নাথের সৃষ্টিচক্র চলিতে পারে না। তথাপি তিনি ইহার সম্মুখে হতাশ হন না, অজ্ঞাত কোনও রহস্যচক্রের মধ্যে আমাদের সমস্ত জটিল প্রশ্ন ও গভীর রহস্য দিনের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। সেই দৃঢ় বিশ্বাসে শিশু যেমন মাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে, তিনিও তেমনি প্রকৃতিকে অর্চ্চনা করেন। তিনি জানেন এই সমস্ত বস্তুমাত্রের মূল কারণ আমাদের অজ্ঞাত, তাহাদের পরম স্রষ্টা রাত্রির ভীষণ গুহান্ধকারের মধ্যে আপনাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। মানুষ সেই পরম কারণকে জানে না অথচ তাহার নিয়ম নম্রশিরে পালন করে, তাহাদের দৃষ্টি অতি ক্ষীণ ও অতি ক্ষণস্থায়ী—

"Nous ne voyons jamais qu'un seul côte' des choses ;
L' autre plonge en la nuit d'unmystère effrayant

L'homme subit le joug sans connaître les causes.
Tout ce qu'il voit est court, inutile et fuyont."

Matthew Arnold-এর "In Harmony with Nature" কবিতায় ঠিক এই সুরেই লিখিয়াছেন,

Know, man hath all which Nature hath,but more,
Bnd in that *more* lie all his hopes of good.
Nature is cruel, man is sick of blood ;
Nature is stubborn, man would fain adore ;
Nature is fickle, man hath need of rest ;
Nature forgives no debt, and fears no grave
Man would be mild, and with safe conscience blest.
Man must begin, know this where Nature ends ;
Nature and man can never be fast friends.

Meredith, Wordsworth ও Shelley প্রমুখ কবির সহিত Vigny ও Matthew Arnoldএর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি একদিকে যেমন ভীষণ ভয়ানক ও রুদ্র তেমনি অপরদিকে তাঁহার একটি দক্ষিণ কল্যাণ মূর্ত্তি রহিয়াছে। একদিকে তিনি যেমন সংহার করেন অপরদিকে তেমনি সৃষ্টি করেন। আমাদের মধ্যে প্রকৃতি যে ধ্বংস আনেন তাহা দ্বারাই আমাদের সন্তানসন্ততিগণের কল্যাণতর অভ্যুদয় সম্পাদন করেন প্রকৃতির এই রহস্য অবগত হইলে তাঁহার ধ্বংসলীলায় আমাদের আর ভয় থাকিবে না। তিনি তাঁহার The Truth in February কবিতায় লিখিয়াছেন

"For love we Earth, then serve we all;
Her mystic secret then is ours;
We fall, or view our treasures fall,
Unclouded, as beholds her flowers."

বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, একই নটরাজ মানুষের চিত্তের ভাবধারার বিচিত্র চলচ্ছন্দে ও প্রকৃতির নানা ঋতুবিহারের বিচিত্র সৌন্দর্য্যলীলার মধ্যে চঞ্চলপদক্ষেপে নৃত্য করিয়া ফিরিতেছেন। মানুষের মধ্যে যে লীলা প্রকৃতির মধ্যেও সেই লীলা। উভয়ের মধ্য দিয়াই এক চেতনপুরুষ আপনাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে, তাই প্রকৃতির মধ্যে সুন্দর বা ভীষণ যাহা-কিছুর সহিতই আমাদের সংস্পর্শ ঘটে তাহাতেই আমরা আমাদের অন্তরের গুহার ভিতর সেই পরমদেবের ঈষৎ স্পর্শ পাই এবং তাহাতেই স্পন্দিত হইয়া আমাদের চিত্ত তাহাকে পাইবার জন্য বিরহব্যথামন্থর হইয়া উঠে।

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশসম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার,
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।

প্রকৃতির সহিত গভীর মিলনে তাঁহার চিত্তে যেন নিত্যই নবতর বিরহের আর্ত্তি জাগিয়া উঠিতেছে।

যদি কৌতুক রাখ চিরদিন
ওগো কৌতুকময়ী,
যদি অন্তরে লুকায়ে বসিয়া
হবে অন্তরজয়ী
তবে তাই হোক্! দেবি, অহরহ
জনমে রহ তবে রহ
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে!
নব নব রূপে ওগো রূপময়
লুণ্ঠিয়া লহ আমার হৃদয়,
কাঁদাও আমারে, ওগো নির্দ্দয়,
চঞ্চল প্রেম দিয়ে।

আবার,

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন,
গগন অন্ধকার;
কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝঙ্কার।
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে,
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে'

মেলে আঁখি চেয়ে থাকি
পাইনে দেখা তা'র ॥

এক গভীর অন্তরোপলব্ধির সংস্পর্শে রবীন্দ্রনাথের চক্ষুতে প্রকৃতি ও মানুষ সম্মিলিত অথচ এই উভয়কে ব্যাপ্ত করিয়া যে দেবী তাঁহার পদ্মাসন পাতিয়াছেন তাঁহাকে পাওয়া কিছুতেই সম্পূর্ণ হয় না, প্রতি পাওয়াতে যেন আরও বিরহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। প্রকৃতিকে শুধু প্রকৃতিভাবে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন না, তাই রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেই প্রকৃতির সম্ভোগের মধ্যেও বিরহের সুরটি এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতসম্বন্ধে লিখিতে গিয়া লিখিয়াছেন

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সঙ্গীতমাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে।

শুধু তাই নয়,

কতকাল ধরে
কত সঙ্গিহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে,
বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ত-তারাশশী
আষাঢ় সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি'

ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি' উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজন বেদন।
সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনিসম
তব কাব্য হতে।

কিন্তু কালিদাসের মেঘদূতে বিরহটুকু কেবলমাত্র মিলনের ছল। কালিদাস প্রধানতঃ ভোগরসের কবি। ইয়ুরোপীয় কবিদের ন্যায় প্রকৃতির সহিত ব্যবহারে তাঁহার মধ্যে কোনরূপ অলৌকিকতা বা mysticism নাই। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি ঐন্দ্রিয়ক উপায় ছাড়া প্রকৃতির সহিত আমাদের কোন আন্তর ধাতুর কোনও অলৌকিক সংস্পর্শ নাই। প্রকৃতি আমাদের গুরু, বন্ধু, সুহৃদ্, ভগিনী বা মাতা নহে। প্রকৃতি নিজে যেন চেতনাময় হইয়া নানা উপভোগে সর্ব্বদা ভোগান্বিতা আবার আমাদের নানাবিধ ভোগের উপাদান যোগাইয়া সর্ব্বদা আমাদের আনন্দবর্দ্ধননিরতা। কালিদাস যেখানে বিরহ আঁকিয়াছেন সে-বিরহ লৌকিক বিরহ মাত্র এবং সেই বিরহের ছায়াও যেন চারিদিকে মিলনের উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত। আমাদের ইন্দ্রিয়জ কামনাকে বা স্ত্রীপুরুষের মিলনের প্রেরণাকে সংসারে সার্থক করিয়া তোলাকে কালিদাস সুখ বলিয়াছেন। এই সুখ উপভোগে কালিদাস কোথাও কোন দোষ দেখেন নাই। সুখোপভোগ বিধি-বহির্ভূত হইলেই দোষের, নচেৎ তাহা যেমন লৌকিক রসের তেমনি কাব্যরসের সঞ্জীবক। মেঘদূতে যক্ষ বিরহার্ত্ত, কিন্তু তাহার গাথাতে

কোথাও বিরহের আর্ত্তি নাই। অলকাপুরীতে পৌঁছিয়াও কোথায় কোন্ যক্ষকন্যা মন্দাকিনীর মন্দারবৃক্ষের ছায়ায় আতপতাপ দূর করিয়া চপলক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছেন, কোথাও বা শিথিলনীবীবন্ধ কামিনীরা মণিময় প্রদীপের উপর কুঙ্কুমচূর্ণ নিক্ষেপ করিতেছে, কোথাও বা চন্দ্রকান্তমণিনির্গত জলবিন্দুতে অঙ্গনাগণের সন্তাপ হরণ করিতেছে, কোথাও বা ধনাধিকারীরা বারবনিতার সহিত আলাপে মত্ত থাকিয়া কুবেরের যশোগানকারী কিন্নরদিগের সহিত উপবনে বিহার করিতেছে, কোথাও বা অভিসারিকাদের কেশদাম হইতে মন্দারপুষ্প ও কর্ণ হইতে কনককমল খসিয়া পড়িল, হার হইতে মুক্তাগুলি ছিঁড়িয়া পড়িল—ইহারই অজস্র বর্ণনা চলিয়াছে। কেবলমাত্র কয়েকটী শ্লোকে যক্ষনারীর বিরহ বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাতেও কিছু এমন দাবদহনের পরিচয় পাওয়া যায় না।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গেরই অবিরোধী সাধনা কালিদাসের অভিমত, তাই তিনি দুষ্কর তপশ্চরণের ভাণ দেখাইয়াছেন। শিবের প্রতি কালিদাসের অগাধ ভক্তি তথাপি পার্ব্বতী যখন মন্দাকিনীপুষ্কর-বীজমালা ত্রিলোচনকে উপহার দিলেন তখম প্রণয়িপ্রিয় মহাদেব তাহা গ্রহণ করিতে হাত বাড়াইলেন, আর সেই অবসরেই পুষ্পধন্বার অমোঘবাণে চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশির উচ্ছ্বাসের ন্যায় তিনি পরিলুপ্তধৈর্য্য হইয়া পার্ব্বতীর বিম্বফলাধরোষ্ঠ বিলোকন করিতে লাগিলেন। কালিদাসের চক্ষুতে মহাদেবের পক্ষেও কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্য হওয়া স্বাভাবিক আর তাঁহার মহত্ত্বপরিকল্পনার মর্য্যাদা কালিদাস এইখানেই

মানিয়াছেন যে, তিনি যে কামবৃত্তিকে দমন করিতে পারিলেন না, তাঁহার নেত্রজন্মা বহ্নি সেই মদনদেবকে ভস্মীভূত করিল। পরিশেষে তিনি পুনরায় পার্ব্বতীকে বিবাহবন্ধনে গ্রহণ করিলেন এবং ভস্মীভূত মদন পুনরুজ্জীবিত হইল। কালিদাসের মতে অন্তর-বাহির উভয়েই এক চৈতন্যের পরিণতি, আমাদের কামনা বাসনা সমস্তই সেই চিৎস্বরূপের পরিণাম। যেমন এক বৃষ্টির জল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রসাবস্থা প্রাপ্ত হয় তেমনি সেই অবিক্রিয় এক চিন্ময় বস্তু আপনাকে ত্রিবিধ গুণের নানা অবস্থাতে পরিণত করেন।

"রসান্তরাণ্যেকরসং যথা দিব্যং পয়োঽশ্নুতে।
দেশে দেশে গুণেষ্বেবম্ অবস্থাস্ত্বমবিক্রিয়ঃ॥"

তপস্বিধর্ম্মে কালিদাসের উৎসাহ নাই, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া শ্রৌতস্মার্ত্ত বিধির নিয়ম না ভাঙ্গিয়া প্রকৃতি চারিদিকে যাহা দিয়াছেন, আমাদের অন্তরের মধ্যে যাহা কিছু কামনা বাসনা আছে তাহার ভোগে কালিদাসের পরমানন্দ। নরনারীর প্রেমের মধ্যে তিনি কিছু কলুষতা দেখেন না, তাঁহার চক্ষুতে সমস্ত পৃথিবী যেন তাঁহার নানা ঋতুচক্রের মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্যের উপহার বহন করিয়া নরনারীর পরস্পরের মিলনের সঙ্গিনী সখীরূপে সজ্জিতা হইয়া রহিয়াছেন। জলে, স্থলে, আকাশে, আলোতে, মেঘে, নদীতে, পুষ্পে, বাতাসে, ভ্রমরে, কোকিলে, চারিদিকে যেন নরনারীর মিলনের একটি প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই চিৎস্বরূপ যেমন আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একদিকে নরনারীর সৃষ্টি করিয়াছেন, বহির্জগতেও তেমনি যেন প্রকৃতির নানা রূপের মধ্য দিয়া

এই যৌনলীলা প্রকটিত করিয়া চলিয়াছেন। প্রকৃতির লীলায় মানুষ তার সখা ও সখী, মানুষের লীলায় প্রকৃতি মানুষের সখী। সমস্ত মেঘদূতের মধ্য দিয়া বিরহী কামীকে উপলক্ষ্য করিয়া জগৎ যেন চেতনাময় হইয়া মিলনমধূৎসব সম্ভোগ করিতেছে। যক্ষের সত্য বিরহ কাল্পনিক মিলনে পূর্ণ হইতেছে। প্রকৃতি ও মনুষ্যের অন্তরালে তাহাদের কারণরূপে যে চিৎস্বরূপ রহিয়াছেন তিনি যেন এ আনন্দনান্দীর মধ্যে আপন বিজয় গান শুনিতেছেন,

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥"
"আনন্দাদ্ধ্যেব ইমানি ভূতানি জায়ন্তে তেন জাতানি জীবন্তি—"

সমস্ত মেঘদূত যেন এই মন্ত্রের রসভারমন্থরা ব্যাখ্যা।

সংসারে পাপ আছে, কলুষতা কদর্য্যতা আছে, পঙ্কিলতা আছে, বীভৎসতা আছে এবং তাহাই লইয়া সংসারের আপামরসাধারণের বাস্তবতার লৌকিক জগৎ, কিন্তু কালিদাস তাঁহার কোনও গ্রন্থে ইহার বর্ণনা করেন নাই। তাঁহার কাব্যে ভীষনাভোগরুক্ষ দণ্ডকারণ্যের কোনও স্থান নাই। পর্য্যস্তনেত্রপ্রকটিতদশন প্রেতরঙ্কের বর্ণনায় কালিদাসের রুচি নাই। সৌন্দর্য্যের সাধক কালিদাসের সৃষ্টিতে যাহা কিছু সুন্দর সুকুমার ও মনোহারী তাহাই স্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কালিদাস পড়িয়া উঠিলে মনে হয় পৃথিবীতে কেবল আনন্দের কোলাকুলি চলিয়াছে, জগন্ময় যেন সৌন্দর্য্য ও সুষমার লীলা চলিয়াছে। কোথাও কোনও উদ্বেগ

নাই, দুঃখ নাই, দ্বন্দ্ব নাই। কালিদাস যেখানে ভয়ের চিত্র আঁকিয়াছেন সেখানেও ভয়টি হইয়াছে গৌণ। ভয়ের মধ্য দিয়াও যেন ভয়কে আড়াল করিয়া একটী চারুতা আমাদের চিত্তকে হরণ করে, পলায়মান ভীত মৃগের ভয়টা তেমন দৃষ্টিগোচর হয় না যেমন দেখি তাহার গ্রীবাভঙ্গের অনুপম ঠাম, তাহার পশ্চার্দ্ধপ্রবিষ্ট পূর্ব্বকায়ের মধ্যে অনুপম গতিবৈচিত্র্য। যুদ্ধের চিত্র কালিদাস অনেক আঁকিয়াছেন, কিন্তু সেই যুদ্ধের শরনির্ঘোষের মধ্যে নিষ্ঠুরতার উদ্দামতা নাই, তাহার অন্তরালে যেন মৃদঙ্গের গুরুগম্ভীর নিনাদ শুনিতে পাই। মদনের মৃত্যুতে মৃত্যুযন্ত্রণার শোকচ্ছবি তেমন ফোটে নাই যেমন ফুটিয়াছে হরকোপানলের শুভ্রভস্মরাশি, রতিবিলাপের মধ্যে যে করুণ রস আছে তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া বিলাসিনীর বিলাসবিভ্রম আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে। "দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগাৎ দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে। বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।" এরূপ অন্তর্গূঢ় গভীর পুটপাকপ্রতিকাশ মর্ম্মন্তুদ করুণ রস কালিদাস আঁকেন নাই।

যে সমস্ত ইয়োরোপীয় কবির কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায় যে, প্রকৃতিকে তাঁহারা মানুষ হইতে পৃথক করিয়া দেখিয়াছেন, মাতা বন্ধু সুহৃদ্ প্রভৃতির ন্যায় প্রকৃতির সহিত একটা অন্তরঙ্গতা অনুভব করিয়া প্রাকৃতিক ধ্যান-রূপের সাহচর্য্যে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আপন জড় দেহকে ভুলিয়া গিয়া অন্তরের উপলব্ধির মধ্যে যেন আপনার চিৎস্বরূপের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। কেহ কেহ বা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের উন্মাদনায় যেন মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন, কেহ

কেহ বা প্রকৃতির অন্তরালে যে বহিঃসত্তাকে অনুভব করিয়াছেন, নারীপ্রেমের মধ্য দিয়া সহজিয়া সাধনে সেই সত্তারই ব্যাপক রূপকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়া যেন অক্ষম হইয়া বলিয়া উঠিয়াছেন, I pant, I sink, I tremble, I expire! কেহ কেহ বা প্রকৃতির ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিয়াছেন, কেহ কেহ ভীষণতার মধ্যেও তাঁহার মহত্ত্ব ঔদার্য্য ও দুর্জ্ঞেয়তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সম্মুখে স্তুতিনম্রশিরে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। কালিদাসের সহিত ইঁহাদের সকলের এইখানেই পার্থক্য, যে, তিনি প্রকৃতিকে দ্বৈতরূপে মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দেখেন নাই। প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও মানুষের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, উভয়কে একত্র সমাহিত করিয়া তিনি এক রসের ও সৌন্দর্য্যের লোক সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোহর, যাহা কিছু চারু, তাহা ছাড়া কালিদাসের চক্ষুতে যেন আর কিছুরই সত্তা নাই। বিধাতার বিভুত্বকে তিরস্কৃত করিয়া কবি প্রজাপতির বৈভবে বিভবান্বিত হইয়া মানসী পরিকল্পনার বলে সমস্ত সৌন্দর্য্যসামগ্রীকে একত্র সমাবেশ করিয়া প্রকৃতি ও মানুষের দ্বন্দ্ব দূর করিয়া এক মৃণালকোমলকান্তির মধ্যে উভয়ের রস সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি যে, কালিদাসের মতে এক চৈতন্যস্বরূপ জড় জগতের ও অন্তর্জগতের নানা বিভূতিরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাসের কাব্যে এ তত্ত্বটী গৌণ, অন্বেষণ-সাপেক্ষ। রসমূর্ত্তিতে উভয়কে এক বলিয়া উপলব্ধি করাতেই কালি-দাসের কাব্যের সাফল্য। ইয়োরোপীয় কবিদের কাব্যে যেমন অনেক

সময়ে তত্ত্বের খোঁচা রসের সাক্ষাৎকার অপেক্ষা প্রবল হইতে দেখা যায়, বস্তুধ্বনি যেমন অনেক সময়ে রসধ্বনিকে ছাড়াইয়া যায়, কালিদাসের কাব্যে তেমনটী হয় নাই। ইহাতে transfiguration নাই, হেঁয়ালি নাই, mysticism নাই, মুখর তত্ত্বোপদেশের বালাই নাই এবং সেইজন্য কালিদাসের মেঘদূত সম্বন্ধে কোন তত্ত্বালোচনা নিস্ফল। তত্ত্বের বীজটী এত ক্ষীণ আর তাহার উপর আঁশরহিত মধুর রসের পেশলতা এত প্রচুর যে, সে বীজটুকু হয়ত অনেক সময়ে আমাদের চোখেই পড়ে না, না পড়িলেও হয়ত ক্ষতি নাই। মেঘদূতের মাধুর্য্যে চিত্ত ভরিয়া উঠিয়া যখন এই দুঃখবহুল প্রাণিলোকের মধ্যে একটী মধুময় সৌন্দর্য্যলোক প্রকাশ করে, এবং তাহার মধ্যে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া যে রসানুভব করে, তাহার মধ্যেই মেঘদূতের যথার্থ সার্থকতা। সেই দৃষ্টিতে আমরা অনুভব করি 'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'।

সিংহলীতে ও তিব্বতীতে মেঘদূতের অনুবাদ হইয়াছিল। মেঘদূতের অনুকরণে পবনদূত হংসদূত প্রভৃতি অনেক দূত রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের দৌত্য নিস্ফল হইয়াছে। কালিদাস হয়ত খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের লোক ছিলেন, তাঁহার বাস ছিল উজ্জয়িনীতে, কি বাংলায়, কি আর কোন স্থানে। গল্পকথায় শুনি তিনি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একটী রত্ন ছিলেন। ঐতিহাসিক হয়ত বলেন একথা মিথ্যা। তাঁহার স্বভাব ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে নানারূপ কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা সত্য কি মিথ্যা তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তাঁহার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তাঁহার কাব্যসৃষ্টির সহিত তাঁহার জীবনের সম্পর্ক

জানিবার জন্য সর্ব্বদাই কৌতূহল হয়, কিন্তু কালিদাস তাঁহার নিজের রসসৃষ্টির মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন।

বাল্মীকির বরপুত্র কবিগুরু তুমি কালিদাস
কত ভাব সুমধুর কত ছন্দে করেছ প্রকাশ।
কোথা তব ঘরবাড়ী কার পুত্র কিছু নাহি জানি,
কার মৌন ভালবাসা কণ্ঠে তব ফুটাইল বাণী ?
কার লাগি রচিয়াছ কবিতার অর্ঘ্য উপহার,
জ্যোৎস্নারাতে মালা গেঁথে কার গলে দিতে ফুলহার ?
দীর্ঘদেহ, পক্ব কেশ, শুভ্রকান্তি, ছিল কি তোমার ?
কিরূপে পরিতে বেশ, পরিতে কি কাঁকন সোনার ?
কিছু নাহি জানি মোরা, তবু সদা জানিবারে চাই,
কত ছল গল্পমাঝে তাই তোমা খুঁজিয়া বেড়াই।
খেলিতে কি বন্ধুসনে ফুল্লমনে খেলা অনিবার,
ঢালিতে কি মধুকণ্ঠে ঝরধার সঙ্গীত সুধার ?
রচিতে কবিতা যবে ভাবিতে কি অনিমেষ আঁখি,
আপনার কাব্যমাঝে আপনারে আবরণে ঢাকি ?
আছিলে কি কবি তুমি ব্রহ্মচারী তপস্বী পরম ?
অথবা কি দেখেছিলে ভোগমাঝে ভোগের চরম ?
অসংযম রূপরাগে ভোগমাঝে কোন শান্তি নাই,
বহ্নিমাঝে ঘৃত দিলে বহ্নি শুধু বলে চাই চাই ;
ব্যথা পেয়ে পেয়েছিলে এ তথ্য কি জীবনে তোমার ?

অথবা নির্লিপ্ত ঋষি করেছিলে সত্যের প্রচার ?
বিরহী যক্ষের মুখে যে ব্যথাটি ফুটায়ে তুলেছ,
আপন বেদনা-গীতি সেথা কি গো আপনি গেয়েছ ?
মানুষের যত দুঃখ, যত প্রেম, যত ভালবাসা,
তব কাব্যকুঞ্জ ঘিরি করিয়াছে চিরন্তন বাসা।
পৃথিবীর যত মধু তিল তিল করিয়া সঞ্চয়,
আপনারে অনায়াসে তারি মাঝে করিয়াছ লয়।
মিথ্যাপথে ইতিহাস খুঁজে ফেরে তব পরিচয়,
আপন কাব্যের মাঝে আপনারে করেছ অক্ষয়।

কাব্যানন্দে বিষয়ানন্দ

Mill যখন বলিয়াছিলেন সুখের মধ্যে স্তর-বিভাগ আছে, তখন সমালোচকেরা এই আপত্তি তুলিয়া ছিলেন যে, একটী সুখের সহিত অপর একটী সুখের পরিমাণগত পার্থক্য ছাড়া অন্য কোনরূপ পার্থক্য নাই। একটী সুখ হইতে অপর একটী সুখ পরিমাণে বেশী হইতে পারে, তীব্রতায় বেশী হইতে পারে, কিংবা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ীও হইতে পারে। সেই সুখ আবার অন্য সুখেরও কারণ হইতে পারে। অথবা অপর সুখের সহিত তুলনায় অধিক পরিমাণে দুঃখ-সম্পর্ক-রহিত হইতে পারে। কিন্তু কোন একটী সুখকে জাতি-মর্য্যাদায় অপর কোন সুখ হইতে উচ্চতর বা উৎকৃষ্ট বলিতে পারা যায় না। সকল সুখই সুখ, সকল আনন্দই আনন্দ, জাতি হিসাবে তাহাদের মধ্যে কোন উচ্চতা-নীচতা নাই। তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে আনন্দের এই স্তর-বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। মানুষের আনন্দের শতগুণ পিতৃলোকের আনন্দ, পিতৃলোকের শতগুণ গন্ধর্ব্বের আনন্দ, গন্ধর্ব্বলোকের শতগুণ কর্ম্মদেবদিগের আনন্দ, কর্ম্মদেবদিগের শতগুণ আজান-দেবদিগের আনন্দ, তাহাদের শতগুণ প্রজাপতি লোকদিগের আনন্দ, প্রজাপতি লোকের শতগুণ ব্রহ্মলোকের আনন্দ। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, যিনি কামনা জয় করিয়াছেন, তাঁহার আনন্দ ও

কর্ম্মদেবদিগের (অর্থাৎ যাঁহারা কর্ম্মদ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন) ও আজানদেবদিগের (অর্থাৎ যাঁহারা আদিকাল হইতেই দেবতা রহিয়াছেন) আনন্দের তুল্য। কাম-জয়ের আনন্দ সমস্ত কাম-উপভোগের আনন্দ অপেক্ষা পরিমাণে অনেক বেশী।

"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎসুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥"

কিন্তু ব্রহ্মলোকের বা ব্রহ্ম প্রাপ্তির আনন্দ, সকল আনন্দ অপেক্ষা অধিক। সমস্ত আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া এইখানে আসিয়া শেষে মিলিত হয়। ইহার সহিত অন্য কোন আনন্দের কোন তুলনাই হয় না। এই পরমানন্দ তৃষ্ণা-বিহীন মানব অপরোক্ষ ভাবে অনুভব করেন।

এই আনন্দের বিচার হইতে দেখা যায় যে, উপনিষদে ও তাহার শাঙ্কর-ব্যাখ্যায় আনন্দের পরিমাণগত পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কোন জাতিগত পার্থক্য স্বীকার করা হয় নাই। এই মত পঞ্চদশী প্রভৃতি পরবর্ত্তী সাহিত্যে উপাধি-ভেদে, একই আনন্দের স্বচ্ছতা ও মলিনতা প্রযুক্ত প্রকার-ভেদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্ত দর্শনের মূলবিচারে দেখা যায় যে, একই আনন্দ, বিবিধ উপাধির সাহচর্য্যবশতঃ নানারূপে প্রতিভাত হয়। উপনিষদের সহিত সঙ্গতি রাখিতে হইলে, বোধ হয় ইহার এইরূপ অর্থ ই দাঁড়ায় যে, উপাধির পার্থক্যবশতঃ আনন্দ-প্রতি-ফলনের যে পরিমাণগত পার্থক্য ঘটে, তাহাই প্রকারগত পার্থক্য রূপে প্রকাশ পায়। মূল আনন্দ এক; তাহার মধ্যে আর কোন প্রকারভেদ বা জাতিভেদ নাই। কিন্তু স্বচ্ছতা ও মলিনতা ছাড়া,

উপাধি-গত অন্য ধর্ম্ম আনন্দে সংক্রমিত হইলে বেদান্ত মতেও ব্রহ্মানন্দ ছাড়া অন্যস্থানে আনন্দের প্রকারগত পার্থক্য স্বীকার করিলে কোন দোষ হয় না। রামানুজ সম্প্রদায়ের শঠমর্ষণ শ্রীনিবাসাচার্য্য আনন্দ-তারতম্য-খণ্ডন-গ্রন্থে (এই গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই) পরিমাণগত পার্থক্য ছাড়া উপায়ও ফলরূপে (শেষ-শেষিত্ব) বা বিবিধ জ্ঞানের সাহচর্য্য-নিবন্ধন আনন্দের প্রকারগত পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন। যদিও মুক্ত ব্যক্তির আনন্দের মধ্যে কোন তারতম্য নাই, তথাপি ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টি ব্যাপারে ও জগত-পালনাদি নানা ব্যাপারে যে বিবিধ স্বতন্ত্র আনন্দ রহিয়াছে, সে আনন্দ মুক্ত জীবেরও সম্ভব নয়।

বিমুক্তাত্মকৃত ইষ্ট-সিদ্ধির টীকায় সুখের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া (এই উভয় গ্রন্থই এখনও প্রকাশিত হয় নাই) শঙ্খপাণি বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ বলেন সুখ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ বা ধর্ম্ম নাই। দুঃখ-নিবৃত্তি বা দুঃখ-নিবৃত্তি-বিশিষ্ট আত্মোপলব্ধিকেই সুখ বলা যায়। ইহার উত্তরে শঙ্খপাণি বলেন যে, কোন কোন স্থানে দুঃখাভাবকেই সুখ বলা যায়। যেমন তাপ দগ্ধ হইয়া যদি কেহ শীতল জলে অবগাহন করে, তবে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহাকে দুঃখ-নিবৃত্তি-রূপ বলা যাইতে পারে। আবার কোনও স্থলে এক কালেই সুখ-দুঃখকে অনুভব করা যাইতে পারে। তাপদগ্ধ ব্যক্তি যদি জলে কটি পর্য্যন্ত অবগাহন করে, শৈত্য-নিবন্ধন নিম্নদেশে সুখ অনুভব করিলেও শরীরের ঊর্দ্ধ দেশে তাপ-নিবন্ধন দুঃখ অনুভব করে। আবার কেহ যদি কর্পূরের সুগন্ধ আঘ্রাণ করে কিংবা বীণার

ঝঙ্কার শ্রবণ করে, তাহা হইলে যে সুখ অনুভূত হয়, তাহাকে দুঃখাভাব বলিয়া বলা যায় না। বাসনার পরিতৃপ্তিকে সুখ এবং বাসনা-বিঘাতকে দুঃখ বলিয়া বলা যায় না। কারণ বাসনা বা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল, এইরূপ অনুভব না করিয়াও, সুখের অনুভব করা যায়। একথাও বলা যায় না যে, সুপ্ত সংস্কার রূপে অবস্থিত বাসনা বা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইলেই সুখ হয়। সকল ব্যক্তিরই হৃদয়ের মধ্যে নানা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা সুপ্তভাবে রহিয়াছে; সেই আকাঙ্ক্ষাগুলি তাহার অনুরূপ বিষয় পাইয়া উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে (সহজো হি রাগঃ সর্ব্বপুংসামস্তি স তু বিষয়বিশেষেণ আবির্ভবতি)। একই বিষয়ে দুইজন বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন পরিমাণের সুখ অনুভব করে। তাহার কারণ-স্বরূপেও বলা যাইতে পারে যে, ঐ দুইটী লোকের চিত্তের বাসনার পার্থক্য প্রযুক্তই, একই বস্তু বিভিন্নরূপ সুখ উৎপাদন করিতে পারে। ইহার উত্তরে শঙ্খপাণি বলেন, অল্পশ্রমে যে সুখ লাভ করা যায়, তাহা বহু শ্রমার্জ্জিত সুখ অপেক্ষা অধিক লোভনীয়। বাসনা-নিবৃত্তিকে সুখ বলিলে বাসনার নিবৃত্তি-ক্ষণেই লোকে নিজেকে সুখী মনে করিত; স্বতন্ত্র সুখ ভোগের প্রয়োজন হইত না, কিংবা সুখোপভোগে বাসনাক্ষয় হইলে তখন লোকে নিজকে সুখী মনে করিত। কারণ সুখভোগের কালে সমগ্র বাসনার নিবৃত্তি হয়, একথা-স্বীকার করা যায় না। সেইজন্যই আবার সুখভোগের সময়ও আকঙ্ক্ষার অনিবৃত্তির জন্য দারুণ দুঃখভোগ সম্ভব হইত। এইজন্য দুঃখাভাব বা আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তিকে সুখ বলা যায় না। কিন্তু সুখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র

ধর্ম্ম বা বস্তু আছে, যাহার স্থিতি কাহারও নিবৃত্তির উপর অপেক্ষা করে না, যাহা আপন মহিমায় অন্য-নিরপেক্ষভাবে আপন বস্তুভূত স্বরূপে আপনার সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখে। যদি আকাঙ্ক্ষার অভাবকেই সুখ বলা যাইত, তাহা হইলে পিত্তপ্রকোপাদি কারণে যে অরুচি জন্মে তাহাকেও ভোগ-সুখ বলিয়া বর্ণনা করা যাইত। এইজন্য ইহা স্বীকার করিতেই হয় যে, সুখরূপ ভাববস্তুর একটা পৃথক্ সত্তা আছে এবং তাহা স্বতন্ত্রভাবে অনুভূত হয় এবং সেই অনুভবজন্য তাঁদৃশ ভোগের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। সেইজন্য ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, দুঃখ-সুখের বোধ পরস্পর-সাপেক্ষ নহে। দুঃখ ব্যতিরেকেও সুখের অনুভব হয় এবং সুখ ছাড়াও দুঃখের অনুভব হয়। কাজেই সুখ, দুঃখ, সুখাভাব ও দুঃখাভাব এই চারটিরই পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপ আছে। সুখের অভাবও দুঃখ নহে, দুঃখের অভাবও সুখ নহে। আনন্দ যে ভাবরূপ পদার্থ তাহার পরিচয় ইহা হইতেও পাওয়া যায় যে, তাহার বেশী কম আছে (আনন্দো ভাবরূপঃ সাতিশয়ত্বাৎ দুঃখবৎ—আনন্দবোধ ভট্টারককৃত প্রমাণমালা)।

সাংখ্যমতেও দেখা যায় যে, তাহারা প্রকৃতিকে সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ তমস্—এই তিনটী গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি কহে। ‘গুণ’ শব্দটী পারিভাষিক। গুণ বলিতে বাংলাভাষায় ধর্ম্ম (quality) বুঝায়। কিন্তু প্রচলিত কাপিল ও পাতঞ্জল সাংখ্যে গুণ ও গুণীর, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর কোনও ভেদ নাই। গুণ বলিতে সাংখ্যেরা দ্রব্যভূত পদার্থ বুঝেন। প্রকৃতি সত্ত্ব-রজঃ-তমঃগুণের সমষ্টিমাত্র, এ কথা বলিলে ইহাই বুঝা যায় যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামে

তিন প্রকারের অতি সূক্ষ্মতম কতকগুলি পদার্থ আছে। এই পদার্থগুলির দ্বারাই মন, চিত্তবৃত্তি, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি যাবতীয় আন্তর-বস্তু ও পঞ্চভূত ও পাঞ্চভৌতিক যাবতীয় জড়বস্তু নির্ম্মিত হইয়াছে। যাহাকে দুঃখ বলিয়া অনুভব করি, তাহার উপাদান সত্ত্বগুণ, যাহাকে দুঃখ বলিয়া অনুভব করি তাহার উপাদান রজোগুণ। তমোগুণ মূঢ়তার ও উদাসীনতার উপাদান। সেইজন্য ইংরেজী হিসাবে ইহাকে state of indifference বা নিরপেক্ষতা বলা যাইতে পারে। সত্ত্বগুণ শুধু যে সুখবস্তুর উপাদান তাহা নহে, ইহা সর্ব্বপ্রকার সাধুতা ও জ্ঞানেরও উপাদান। সত্ত্বগুণের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে, জ্ঞানের প্রসন্নতা ও ঔদার্য্য বাড়ে। কিন্তু যে পরিমাণে এই সত্ত্বগুণ রাজোগুণের সহিত থাকে সেই পরিমাণে উহা সুখ-দুঃখের সহিতও মিশ্রিত থাকে। যোগীরা যখন যোগমার্গে আরোহণ করিতে থাকেন, তখন ক্রমশঃ রজোগুণের হ্রাস হয় ও সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় এবং সেই অনুসারে ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে সুখ-সম্প্রসাদের বৃদ্ধি হইতে থাকে। জাগতিক সর্ব্ববিধ সুখ-সম্ভোগের মধ্যেই কিছু না কিছু দুঃখ সংলগ্ন রহিয়াছে। এই মতে সুখ, দুঃখ এবং উদাসীন অবস্থা এই ত্রিবিধ স্বরূপই স্বীকৃত হইয়াছে। বেঙ্কট তাঁহার সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিতে ইহারই অনুবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন যে, দুঃখাভাবকেও সুখ বলা যায় না, সুখাভাবকেও দুঃখ বলা যায় না। সুষুপ্তি অবস্থায় সুখও নাই, দুঃখও নাই। (শঙ্করমতে কিন্তু সুষুপ্তিতে পরমানন্দের স্বয়ংভান হয়।) এইজন্য সুখ-দুঃখাতিরিক্ত একটী স্বতন্ত্র উদাসীন অবস্থাও স্বীকার করিতে হয়।

বৌদ্ধেরা বলেন যে, সুখ-দুঃখ জ্ঞানেরই ধর্ম্ম, কারণ যে কারণে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, জ্ঞানে ভাসমান সুখ-দুঃখাদিও সেই কারণেই উৎপন্ন হয়। এককারণোৎপত্তি-নিবন্ধন কার্য্যের একত্ব স্বীকার করিতেই হয়। অতএব সুখাদি জ্ঞানেরই রূপ। কোন কোন বৌদ্ধেরা এ কথাও বলেন যে, সুখাদি বিষয়ানুভবাত্মক জ্ঞানেরই নানাপ্রকার রূপ। কোন কোন বিষয়স্বভাবের অনুভব ছাড়া সুখ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তুর অনুভব হয় না। বিবিধ সুখের উচ্চতা-নীচতা বলিয়া যাহা কিছু পার্থক্য অনুভূত হয়, বা সুখের পরিমাণগত যাহা কিছু পার্থক্য অনুভূত হয়, তাহার মূলে কোন বিবিধ প্রকারের সুখবস্তুর বা সুখধর্ম্মের অনুভব নাই। বিষয়ের বিচিত্রতা প্রযুক্ত বিষয়ানুভবের যে বিচিত্রতা আছে, সেই বিচিত্রতাই সেই বিষয়ানুভবস্যন্দি বিবিধ সুখানুভব রূপে অনুভূত হয়। Mill যখন Plato-র Republic-এর অনুসরণ করিয়া সুখের মধ্যে প্রকারগত ভেদ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার সমালোচনায় Norman Wilde যাহা বলিয়াছেন, "John Stuart Mill's revival of the Platonic doctrine of differenc of kind in pleasure involves the failure to make the analysis into pleasantness and pleasant objects, with the conseqnent apparent ascription to the one of the moral worth found in the other ......" তাহা এই জাতীয় সমালোচনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বৌদ্ধদের মতে সংশয়জ্ঞান, কি ভ্রমজ্ঞান, যেমন জ্ঞানেরই বিভিন্নরূপ, সুখজ্ঞান দুঃখজ্ঞানও তেমন জ্ঞানেরই বিভিন্নরূপ। ইহার উত্তরে

নৈয়ায়িক বলেন যে, সুখ-দুঃখ বিষয়বস্তুর ন্যায় কোন বাহ্যবস্তু নহে; সেই জন্যই সুখ-দুঃখকে বিষয়গ্রহণরূপে কখনই আমরা অনুভব করি না। বৌদ্ধেরা তাহার উত্তরে বলেন যে, সুখ-দুঃখাদি আন্তর-বস্তু হইলেও, তদ্বিষয়ক জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হয় বলিয়াই, তাহাকে জ্ঞানেরই এক রূপ বলিয়া ধরা যাইতে পারে; এবং এই হিসাবে সুখাদিকে গ্রাহ্য-গ্রহণোভয়-স্বভাবাত্মক বলা যাইতে পারে। জ্ঞানের ন্যায় সুখাদিও স্বপ্রকাশ। সেই জন্য প্রকাশাত্মক জ্ঞানের সহিত সুখাদিরও কোন ভেদ নাই। নৈয়ায়িক বলেন যে, জ্ঞান যেমন নানা কারণসঙ্ঘাতে উৎপন্ন হয়, সুখাদিও তেমনি স্বকীয় বিশিষ্ট কারণকলাপের দ্বারা উৎপন্ন হয়। সুখধর্ম্ম উৎপন্ন হইলে জ্ঞানের দ্বারা তাহা গ্রহণ করা যায়। নীলবস্তু দেখিতেছি বলিলে যেমন জ্ঞান হইতে নীলবস্তু পৃথক বলিয়া অনুভূত হয়, সুখ অনুভব করিতেছি বলিলেও, সুখ জ্ঞান হইতে পৃথক বলিয়া অনুভূত হয়। জ্ঞানই সুখাত্মক এইরূপ অনুভব আমাদের কখনও হয় না। "সুখজ্ঞানাত্মপ্যনুভূয়মানং সুখেন বিষয়ভাবজুষা ঘটাদিনৈবো-পরজ্যতে ইতি গম্যতে ন স্বরূপেণৈব সুখাত্মকং ততো ভিন্নরূপস্য বোধমাত্রস্বভাবস্য জ্ঞানস্যান্যদাদৃষ্টত্বাদিতি। তস্মান্ন বোধরূপাঃ সুখাদয়ঃ" (ন্যায়মঞ্জরী)। শুধু বিষয়ের অনুভবের দ্বারা নহে, বিষয়ের স্মৃতি বা সংকল্পের দ্বারাও সুখ অনুভূত হইতে পারে। বৌদ্ধমতে তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞান ছাড়া সুখ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। জ্ঞানের বিবিধ প্রকার-ভেদে সুখেরও বিবিধ প্রকারগত ভেদ আছে, কিন্তু পরিমাণগত ভেদ নাই। সাঙ্খ্যমতে সত্ত্বদ্রব্য জ্ঞানাত্মকও বটে,

সুখাত্মকও বটে। কজেই এই মতেও সুখ ও জ্ঞানের কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু সত্ত্বগুণের আধিক্য এবং রজঃ ও তমঃ গুণের সংমিশ্রণে ন্যূনাধিক্যবশতঃ সুখের পরিমাণগত ও প্রকারগত পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে। ন্যায়মতে প্রত্যেক সুখ অন্যান্য বস্তুর ন্যায় স্বকীয় বিশেষ বিশেষ কারণ সমবায়ের দ্বারা উৎপন্ন হয়। সেই জন্য সুখের পরিমাণগত ও প্রকারগত উভয়বিধ পার্থক্যই সম্ভব।

ইয়োরোপীয় মতের অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে, Stout, Marshall প্রভৃতির মতে সুখ ও দুঃখ উভয়ই জ্ঞানবৃত্তির দুইটি বিভিন্ন ধর্ম্ম এবং পরিমাণগত পার্থক্যেই ইহাদের একরূপ প্রকারগত পার্থক্য সাধিত হয়। সুখ-বিষয় ছাড়া সুখের কোন স্বতন্ত্র অনুভব নাই। Beaunis তাঁহার Sensations Internes গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, সুখ ও দুঃখ উভয়ই একটা অনুভব-সামান্যের প্রকারগত বা পরিমাণগত ভেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। Herbert Spencer বলেন যে, যেরূপ কার্য্য আমাদের সংরক্ষণের অনুকূল তাহার সহিতই সুখ অনুস্যূত হয়, এবং যাহা প্রতিকূল তাহা দুঃখ উৎপন্ন করে। Wundt বলেন যে, আমাদের যান্ত্রিক নাড়ীচক্রের নানাবিধ প্রকারের মৃদু ও কঠোর বিক্ষোভে নানারূপ সুখ ও দুঃখের অনুভব হয়। "Experience attests that, in all the sensory regions, sensations of moderate energy are specially accompanied by a feeling of pleasure." যদিও তিনি আমাদের অনুভবগুলিকে সুখ-দুঃখ, উত্তেজনা অবসাদ, শ্রম ও বিরাম (tension and relaxion) এই তিন-

ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তথাপি এই তিনটির মধ্য দিয়া সুখ-দুঃখের প্রকার ও পরিমাণগত ভেদই স্পষ্ট হইয়া উঠে। Titchnerও সুখ-দুঃখের প্রকার ও পরিমাণগত ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আর অধিক আলোচনা করার প্রয়োজন নাই।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে সমস্ত প্রধান প্রধান মতগুলির কথা আমরা এখানে আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অধিকাংশেরই মতে সুখের মধ্যে একটা প্রকারগত ভেদ অর্থাৎ একটী সুখ হইতে যে আর একটী সুখ বিভিন্ন প্রকারের এই কথা স্বীকৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বা কেবলমাত্র পরিমাণগত ভেদ স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদিগকেও পরিমাণগত ভেদ হইতেই একটা প্রকারগত ভেদ যে উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। কেহ বা আবার কেবলমাত্র প্রকারগত ভেদ মানিয়াই, সেই ভেদ হইতে পরিমাণগত ভেদ মানিয়াছেন। কেহ কেহ বা পরিমাণগত ও প্রকারগত উভয়বিধ ভেদই স্বীকার করিয়াছেন।

আনন্দ বা সুখের পরিমাণগত পার্থক্য ছাড়া যখন প্রকারগত পার্থক্য মানিতে হয়, তখন সাহিত্যিকেরা যে কাব্যের আনন্দকে অলৌকিক বলিয়া বলেন একথা স্বীকার করিতে তেমন দ্বিধা হওয়ার কারণ নাই। কাব্যের আনন্দ অন্য সকল আনন্দ অপেক্ষা বিভিন্ন প্রকারের। কিন্তু কাব্যের আনন্দ অলৌকিক ইহা বলিতে আমরা কি বুঝি, তাহাই বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতে হয়। বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়

যে, সর্ব্বপ্রকার সুখ-দুঃখসম্ভোগের মূলেই নাড়ীচক্রের মৃদু-মধ্য-তীব্র উত্তেজনা রহিয়াছে। লৌকিক বস্তুর ও ইন্দ্রিয় উপভোগের সময়ও যেরূপ নাড়ীচক্রের নানাবিধ উত্তেজনা উৎপন্ন হয়, সৌন্দর্য্য উপভোগের, রস সম্ভোগের আনন্দেও সেইরূপ নাড়ীচক্রের একটা উত্তেজনা কারণীভূত হইয়া থাকে। লাল, নীল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের রূপ ও তাহাদের বিচিত্র সমাবেশ, শব্দের বিচিত্র সন্নিবেশ ও সংমিশ্রণ স্বভাবতঃই আমাদের নাড়ীচক্রে বিভিন্ন জাতীয় উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এই জাতীয় নাড়ীচক্রের উত্তেজনায় মনে যে হর্ষের উদয় হয়, সঙ্গীতে তাহার প্রচুর নিদর্শন দেখাইতে পারা যায়। মধুর গীত-বাদ্যের দ্বারা কেবল যে মানুষের মনে আনন্দ উপস্থিত হয় তাহা নয়; কুকুর, বিড়াল, অশ্ব, সর্প, হস্তী প্রভৃতি নানা প্রাণীকেও গীত-বাদ্যের দ্বারা আকৃষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। Beauquier তাঁহার Philosophie-della-musique গ্রন্থে ইহার প্রচুর আলোচনা করিয়াছেন। Fere অনেক পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, বর্ণের বিচিত্রতায় মনের মধ্যে নানাপ্রকার উত্তেজনা, অবসাদ, হর্ষ ও বিষাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনেক অসভ্যদের মধ্যে দেখা যায় যে, প্রায় সুর-তাল-লয় বিহীন কেবল শব্দাত্মক ধ্বনির দ্বারা মানুষ প্রায় উন্মত্তের মত হইয়া উঠে। আমাদের গাজনের বাদ্য ইহার একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিঞ্চিৎ সুর-তাল-যুক্ত হইলে ইহা কিরূপ ভাবোন্মাদ জন্মাইতে পারে, তাহা আমাদের দেশের কীর্ত্তনের বাদ্যে সুস্পষ্ট। সামরিক বাদ্য যে যোদ্ধৃবর্গকে কিরূপ রণোন্মত্ত করিয়া তুলে তাহা সকলেই জানেন। কেবল শব্দাত্মক

বাদ্যের দ্বারা অসভ্য জাতিরা কিরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠে ও আনন্দ পায় তাহা Walla Schek তাঁহার Primitive Music গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সঙ্গীতের দ্বারা যে নানাবিধ রোগ দূর করা যায় Boudet, Granville, Buccola, Moreselli প্রভৃতির গ্রন্থে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। James বলেন যে, সমস্ত ভাবসম্বেগের (Emotion) মূলেই নাড়ীগত, পেশীগত ও রক্তকোষ-গত বিক্ষোভ রহিয়াছে। তাঁহার মতে ভাবসম্বেগ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। জ্ঞান-জন্য শারীর-বিক্ষোভ ও শারীর-বিক্ষোভের স্বতন্ত্র সংবিদ-জন্য যে মনের অবস্থা তাহাকেই ভাবসম্বেগ বলে। আমাদের দুঃখ হয় বলিয়া আমরা কাঁদি না, আমরা কাঁদি বলিয়া দুঃখ অনুভব করি। আমাদের ক্রোধ হয় বলিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ ও বিস্ফারিত হয় না, চক্ষু রক্তবর্ণ ও বিস্ফারিত হয় বলিয়াই ক্রোধ অনুভব করি। এই মতে ভাবসম্বেগ বা Emotion সংবিদেরই প্রকার বিশেষ এবং এই হিসাবে বৌদ্ধমতের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। Fechner তাঁহার 'Vors-chule-der Æsthetic' গ্রন্থে শারীর-বিক্ষোভকে সৌন্দর্য্য সম্ভোগের এবং ভাবসম্বেগেরও কারণ বলিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু James-এর এই মত যে সকল ভাবসম্বেগ সম্বন্ধেই খাটে, ইহা কোন পারীক্ষিক উপায়ে নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। Dr. Burkley তাঁহার 'Brain' গ্রন্থে দুইটী লোকের যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, তাহাদের শরীর সম্পূর্ণভাবে অসাড় হইয়া গিয়াছিল (Cutaneous and Sensory anæsthesia) তথাপি তাঁহাদের

লজ্জা, ঘৃণা প্রভৃতি বোধ ছিল। আমাদের দেশের সাহিত্যে কাব্যরসের আনন্দে যে অশ্রুপাতাদি শারীর-বিক্ষোভের কথা শুনা যায়, তাহা চিত্তের একরূপ দ্রবীভাবের দ্বারা সঙ্ঘটিত হয় বলিয়া বলা হইয়াছে।

এখন কথা উঠিতে পারে এই যে, লৌকিক ভাবসম্বেগ সম্বন্ধে যে কথা খাটে, কাব্যরসের উপভোগ সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। কাব্যরসের আনন্দ বলিতেও প্রশ্ন উঠে যে, এই আনন্দ কাহার? যে কবি কাব্য-সৃষ্টি করেন, কাব্যসৃষ্টি-দশায় তাঁহার যে আনন্দ তাহাকেই কি কাব্যানন্দ বলিব কিংবা যে পাঠক বা শ্রোতা কাব্য পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, তাঁহারই আনন্দকে কাব্যানন্দ বলিব? যিনি কাব্য সৃষ্টি করেন তিনি বাহ্য জগতের রেখা-সন্নিবেশ, বস্তু-সন্নিবেশ ও রূপের বৈচিত্র্যদ্বারা প্রোৎসাহিত হন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই রূপরেখাদির সন্নিবেশ যখন তাঁহার চিত্তের মধ্যে ভাবময় হইয়া উঠে, ভাবচ্ছবিতে পরিণত হয়, তখনই সেই চিত্ত-সম্ভারের ভাবময় ও বৃত্তিময় উপাদান লইয়াই তিনি কাব্যসৃষ্টি করেন। কাজেই কবি যে জগৎ হইতে তাহার কাব্যের উপাদান প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ করেন, তাহা বাহ্যরূপাদির ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ হইতে মুখ্যতঃ সংগৃহীত হয় না। কিন্তু তথাপি কবিদের কাব্য পড়িলে অনেক সময়ে দেখা যায় যে, বহির্জগতের আনন্দ তাঁহারা যে ভাবে চিত্তের ভাবচ্ছবির পর্ণপুটে গ্রহণ করিয়াছেন ও কাব্যের মধ্য দিয়া তাহা যে ভাবে উচ্ছল করিয়া প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহা ইন্দ্রিয়জ সম্ভোগের তীব্রতাকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

"My heart aches, and a drowsy numbness pains
My sense, as though of hemlock I had drunk,
Or emptied some dull opiate to the drains
One minute past, and Lethewards had sunk."

মম্মট ভট্ট কাব্যরসের আলোচনায় নির্ব্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, দৈন্য, চিন্তা, গর্ব্ব, বিষাদ, আবেগ, ঔৎসুক্য প্রভৃতি বিবিধ লৌকিক ভাবসম্বেগকে কাব্যরসের উপাদান বর্ণনা করিয়াছেন।

অভিনবগুপ্ত কাব্যরসের অলৌকিকত্ব প্রতিপাদনের প্রধান পুরোহিত। তিনিও কাব্যরসের সম্ভোগের সহিত ইন্দ্রিয়জ সম্ভোগের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, আমাদের মধ্যে স্বচ্ছ আনন্দ-স্বরূপ যে পরম পুরুষ রহিয়াছেন, তিনি ইচ্ছাশক্তিদ্বারা বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিতে চাহিয়া, জ্ঞানশক্তি দ্বারা সেই জগৎকে আমাদের জ্ঞানভূমিতে প্রকাশ করেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের অসীম রূপকে সঙ্কুচিত করিয়া সসীম জীবকে সৃষ্টি করিয়া তাহার নিকট সেগুলিকে প্রকাশ করেন। কিন্তু কোন মধুর গান শ্রবণে, কোন মধুর চন্দনাদিস্পর্শে এই সঙ্কুচিত জীব, যখন এই সঙ্কুচিত স্বভাব পরিত্যাগ করে, তখন তাহার হৃদয়ে যে স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহাদ্বারা সেই অনুভব স্বভাবের সহিত তাহার পার্থক্য দূরীভূত হয়। আর তাহাদ্বারা বিচিত্র জগতের আনন্দময় স্বভাব তাহার নিকট পরিস্ফূর্ত্ত হয় এবং তাহাতে তাহার চিত্ত রসধারায় বিগলিত হয়।

তথাহি মধুরে গীতে
স্পর্শে বা চন্দনাদিকে ॥
মাধ্যস্থ্যবিগমে যাসৌ
হৃদয়ে স্পন্দমানতা।
আনন্দশক্তিঃ সৈবোক্তা
যতঃ সহৃদয়ো জনঃ ॥

শ্রীপ্রশস্তিভূতিও বলিয়াছেন—

যে যে ভাবা হ্লাদেন ইহ দৃশ্যাঃ সুভগসুন্দরাকৃতয়ঃ।
তেষামনুভবকালে স্বস্থিতিপরিপোষণং সতামর্চা ॥

কবি যখন কাব্যসৃষ্টি করেন এবং সহৃদয় পাঠক যখন তাহা পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন, তখন তাঁহাদের উভয়েরই মানস-ব্যাপারের মধ্যে একটা সাধারণীকরণ বিদ্যমান থাকে। সাধারণীকরণ শব্দটী নানা অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু আমরা এখানে ইহা যে অর্থে ব্যবহার করিতেছি, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, উভয়েই তাঁহাদের স্বকীয় দেশ-কাল ও নানা অবস্থাবিশেষের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়া সেই কাব্যসৃষ্টির বিচিত্র রচনার মধ্যে আপনাকে তন্ময় করিয়া ফেলেন। অভিনবগুপ্ত বলেন যে, কবি কিংবা পাঠকের স্বকীয় মর্ত্ত্যলোক যখন কাব্যলোকের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়, তখন সেই নিমগ্নতার মধ্যে তাঁহার সাংসারিক স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের পার্থক্য ও ভেদ যে পরিমাণে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে তিনি কাব্যরসের সম্ভোগে অধিকারী হন।

যে পরিমাণে মানুষ নিজেকে তাহার সাংসারিক ও লৌকিক নানা অবস্থার সংঘাতের দ্বারা জড়িত ও বেষ্টিত রাখে, সেই পরিমাণেই তাহার চিত্ত সঙ্কুচিত থাকে। যে পরিমাণে কাব্যসৃষ্টির মধ্যে আপনাকে সে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেয়, ঠিক সেই পরিমাণে সে কাব্যরসের আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। এই সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দেওয়ার নাম ব্যক্তিত্ব-বিসর্জ্জন বা সাধারণীকরণ। অভিনব গুপ্তের মতে কোন ইন্দ্রিয়জ শব্দ-রূপাদি বিষয়ের গভীর সম্ভোগের সময়েও মানুষের ব্যক্তিত্ব এমনি করিয়া পরিলুপ্ত হইতে পারে। তখন মানুষ সেই ইন্দ্রিয় ও বিষয়কে নিজের সীমাবদ্ধ প্রকৃতির নানা সীমাবদ্ধ প্রয়োজনের মধ্য দিয়া দেখে না কিন্তু সে তাহার সীমাবদ্ধ প্রকৃতিকে সেই রূপানুভবের মধ্যে বিলীন করিয়া দেয়। সেইক্ষণে তাহার যে সাধারণীকরণ হয়, সেই সাধারণীকরণের মধ্য দিয়া আনন্দরসে নিমগ্ন হয়। ইন্দ্রিয়ভোগের মধ্যে যে বিশেষ একটি concreteness বা স্বলক্ষণ-স্বরূপ আছে, ব্যবহারিক জীবনের তাড়নায় আমরা অনেক সময়েই তাহার দিকে দৃষ্টি করি না। সেই জন্যই ইন্দ্রিয়সম্ভোগ তাহার যথার্থ স্বরূপকে আমাদের মধ্যে প্রতিফলিত করিতে পারে না, তাহা কেবলমাত্র নানা জৈব-প্রয়োজনের উপায়ীভূত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় উপলব্ধির স্বলক্ষণ-স্বরূপের মধ্যে যে আনন্দসম্ভোগ ঘটে, তাহা যে প্রকার-মর্য্যাদায় কেবল কাব্যানন্দ নয়, ভূমানন্দের তুল্য তাহা উপনিষৎকারও লক্ষ্য করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলেন—

তৎ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ নান্তর-

মেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ (বৃহদারণ্যক ৪, ৩, ২১)। শুধু তাহাই নহে, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ প্রভৃতি কোন ভাবসম্বেগের মধ্যেও যদি মানুষ আপনাকে হারাইয়া ফেলে তাহা হইলে সেখানেও একটা এইরূপ সাধারণীকরণ হয় এবং সেই মুহূর্তে সেই ব্রহ্মসত্তাকে প্রাপ্ত হয়। ভট্ট কল্লট লিখিয়াছেন—

অতিক্রুদ্ধঃ প্রহৃষ্টো বা কিং করোমীতি বা মৃশন্।
ধাবন্ বা যৎপদং গচ্ছেত্তত্র স্পন্দঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥

বিজ্ঞানভৈরবেও দেখিতে পাওয়া যায়—

ক্রোধাদ্যন্তে ভয়ে শোকে গহ্বরে বারণে রণে।
কুতূহলে ক্ষুদাদ্যন্তে ব্রহ্মসত্তাসমীপগা॥

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, নিছক ইন্দ্রিয়ানন্দের সহিত কাব্যানন্দের একটা গভীর সাদৃশ্য রহিয়াছে। কাব্যস্রষ্টার সময়ে বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য হইয়া কোন প্রাকৃতিক বস্তু বা তাহার ভাবচ্ছবি বা কোন নিজের অন্তরের গভীর অনুভূতির সহিত যখন একাত্ম হইয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলেন, তখনই তিনি কাব্য সৃষ্টি করিবার অধিকারী হইতে পারেন।

Bergson বলিয়াছেন—

The aesthetic intuition, a faculty which exists in man alongside of normal perception is a kind of sympathy, "une espice de sympathie"; the artists, by

means of this variety of sympathy places himself within the interior of the object. The aim of art, indeed, is to put to sleep the active powers of our personality, and so to bring us to a state of perfect docility, in which we sympathise with the emotion expressed; while we sympathise with nature whenever she exhibits the faintest sign of human feeling or mood. Any emotion whatever can be called aesthetic in this way; there is no specific feeling of beauty. কাজেই দেখা যাইতেছে যে বিষয়বস্তুর আনন্দের মধ্যেই কাব্যের সৃষ্টি, লৌকিক আনন্দের উপর নির্ভর না করিয়া কাব্যানন্দ দাঁড়াইতে পারে না।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, কোন কোন কবির চিত্ত বিষয়ানন্দকে ছাড়িয়া এই বিশ্বের মধ্যে যে নানা জটিল রহস্য রহিয়াছে, তাহারই মহিমায় উপপ্লুত হইয়া একটী গভীর ভাবসম্বেগে আপনার চিত্তকে তরঙ্গ-লীলায় বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু সে-সব স্থলেও বিশ্বরহস্যের সেই মহিমা কবি যখন প্রকাশ করিতে চান, তখন ইন্দ্রিয়জ-রূপের বিলাসের মধ্য দিয়া সেই রহস্য যতটুকু পরিমাণে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িতেছে, সেইটুকুর মধ্য দিয়াই তাহাকে প্রকাশ করিয়া যথার্থ সার্থকতা লাভ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'চঞ্চলা' কবিতাটী লওয়া যাইতে পারে—

হে বিরাট্ নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।

স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে ;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে ;
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হ'তে ;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য্য চন্দ্র তারা যত
বুদ্বুদের মতো।

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,
চলেছো যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর।
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া ?
সর্ব্বনাশা প্রেম তা'র, নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া !

বিশ্বময় যে বিরাট গতির ঘূর্ণাচক্র চলিয়াছে বৃহদারণ্যকের কবি

তাহাকে অশ্বের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে নদীস্রোতের মধ্যে উপলব্ধি করিতেছেন। এই নদীস্রোতের মধ্যেই তাঁহার কবিচিত্ত আত্মহারা ও বাধাবন্ধহীন হইয়া এই বিরাট গতি-রহস্যের মহিমার মধ্যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। আবার সেই বিরাট অনুভূতিকে চঞ্চল ফেনভঙ্গ-মুখর নদীবেগের মধ্য দিয়া মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। সেই গতি-রহস্যের আনন্দকে নিজের সৃষ্টির মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন এবং পাঠকের কাছে তাহাকে প্রমাণ করিয়াছেন।

কোন সময়ে বা দেখা যায় যে, প্রকৃতির মধ্যে যে স্বচ্ছ সুন্দর রূপের শোভা ইন্দ্রিয়দ্বারে আঘাত করে, সেই আঘাতেরই মৃদুকম্পন কবির হৃদয়ের নিভৃত কোণদ্বারকে ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ইন্দ্রিয়ের আনন্দের ঝঙ্কার ইন্দ্রিয়ের আনন্দকে যেন নূতন রঙের আবেশে ভরিয়া দেয়।

আজ প্রভাতের আকাশটি এই
শিশির ছলছল,
নদীর ধারের ঝাউগুলি ঐ
রৌদ্রে ঝলমল,
এমনি নিবিড় করে'
এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভরে'
তাই ত আমি জানি,
বিপুল বিশ্ব ভুবন খানি
অকুল মানস-সাগর-জলে
কমল টলমল।

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে লৌকিক আনন্দের কোন প্রকারগত পার্থক্য আছে কি না ইহার আলোচনা করিয়াছিলাম। সেই অবসরে ইহা দেখান হইয়াছে যে, হয় পরিমাণগত প্রভেদে, নয়, বিভিন্ন জাতীয় জ্ঞানের সাহচর্য্যবশতঃ, কিংবা বিষয়ের বৈচিত্র্যবশতঃ বিষয়ানন্দে প্রকারগত তারতম্য লক্ষিত হয়। এই প্রকারগত তারতম্যের মধ্যে কোন উচ্চ-নীচ বিভাগ করা যায় কি না সে আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে করিব না। কিন্তু বিষয়ভেদে, পরিমাণভেদে ও অন্যান্য জ্ঞানবৃত্তির সাহচর্য্য-নিবন্ধন বিষয়ানন্দের যেমন নানা প্রকারভেদ লক্ষিত হয়, সুখ-দুঃখ যেমন স্বতন্ত্র বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়, কাব্যানন্দের মধ্যেও সেই সমস্ত ভেদ উপলক্ষিত হয়। বিষয়ানন্দের উপরে নির্ভর করিয়া কাব্যানন্দ উদ্বুদ্ধ হয় এবং বিষয়ানন্দের মধ্য দিয়াই তাহার প্রকাশ হয়। এমন কি যখন কোন অরূপ, গভীর ভাব কিংবা বিরাট কোন গভীর রহস্যের অনুভব আমাদের অন্তরাত্মাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, তখন সেই জাগরণের মূলেও ইন্দ্রিয়জ বোধ ও আনন্দোদ্বোধকরূপে কাজ করে। সেই গভীর অন্তরানুভূতিকে ইন্দ্রিয়জ রূপের মধ্য দিয়া কবি যে পরিমাণে ফুটাইতে পারেন, সেই পরিমাণেই কাব্যানন্দ-সৃষ্টিতে তিনি সার্থক হন।

James-এর মতের আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে যে, লৌকিক ভাবসম্বেগের অধিকাংশ স্থলেই নাড়ীচক্রের কিম্বা রক্তকোষের একটা বিক্ষোভ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই বিক্ষোভজন্য অনুভূত ভাব-সম্বিদ্‌কে ভাবসম্বেগ বা Emotion বলা হয়। James-এর

একথা হয়তো সত্য নহে, কিন্তু অধিকাংশ ভাবসম্বেগের উপলব্ধির সহচররূপে শরীর-যন্ত্রের যে বিক্ষোভ হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। লৌকিক ভাবসম্বেগ স্থলে একথা যেমন সত্য, কাব্যের ভাবসম্বেগ স্থলেও একথা প্রায় সেই পরিমাণই সত্য। বিশ্বনাথ কবিরাজ কাব্যরসের উপলব্ধিতে যে ভাবসম্বেগ হয় তাহার সহচররূপে যে সমস্ত শরীর-যন্ত্রের বিক্ষোভ দেখা যায়, তাহার অনেক বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইতে একটী উদাহরণ দিতেছি—

স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চং স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, লৌকিক ভাবসম্বেগে যেরূপ শরীর-যন্ত্রের নানাবিধ বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, কাব্যোপলব্ধিজনিত ভাবসম্বেগের দ্বারাও সেইরূপ শরীর-যন্ত্রে নানা বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, এই জন্যই লোলুপতা ও লালসতার রসচিত্র যে কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মনের লৌকিক লালসা বাড়িয়া উঠে এবং ইন্দ্রিয় ভোগের দিকে মন প্রধাবিত হয়। এই জন্যই এই শ্রেণীর কাব্য সম্বন্ধে প্রাচীনেরা বলিয়াছেন,—'কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ'। এই শ্রেণীর কাব্য পড়িলে অনেক সময়ে মনে হয় যেন মলিন কর্দ্দমাক্ত জলে স্নান করিয়া উঠিলাম। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনেক কবিতায় ইন্দ্রিয়-ভোগের যে জ্বলন্ত স্পর্শ পাওয়া যায় তাহা অনেকেই জানেন।

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হ'তে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখীর সাথে
দিনে রাতে
এই বাসা-ছাড়া পাখী ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হ'তে কোন্ পারে !
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা,
অন্য কোনোখানে।

কিংবা

Hence in a season of calm weather
Though inland far we be,
Our souls have sight of that immortal sea
Which brought us hither ;
Can in a moment travel thither—
And see the children sport upon the shore
And hear the mighty waters rolling ever more.

এই জাতীয় কবিতা পড়িলে আমাদের চিত্তের মধ্যে যে জিজ্ঞাসা উদ্বুদ্ধ হয়, তাহাতে আমাদের চিত্ত যেন ইন্দ্রিয়ের দ্বার হইতে প্রত্যাবৃত্ত

হইয়া এক গহন গভীর আন্তর প্রদেশের দিকে ধাবিত হয় এবং একটী মূক, মৌন আনন্দের সৃষ্টি করে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, কাব্যানন্দ প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়ানন্দের উপর নির্ভর করিয়াই রহিয়াছে এবং ইন্দ্রিয়ানন্দের সহিত ইহার একটী প্রকারগত ও পরিমাণগত সামঞ্জস্য আছে। উৎপত্তিতে ইহা ইন্দ্রিয়ানন্দের সহিত একরূপ সোদর সম্বন্ধে বিজড়িত। ইন্দ্রিয়ানন্দের সহিত শারীর-বিক্ষোভের যে সম্বন্ধ ইহারও যে শরীর-যন্ত্রের সহিত অনেকটা সেইরূপই সম্বন্ধ তাহা নহে। কাব্যানন্দ অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়ানন্দতে পরিণত হয় ও ইন্দ্রিয়ানন্দও অনেক সময়ে কাব্যানন্দের গভীরতম প্রদেশে আমাদের চিত্তকে টানিয়া লইয়া যায়।

আমাদের লৌকিক জীবনের সহিত আমাদের কাব্যজীবনের অনেক সময়ে একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে। সেইজন্য অনেক সময়ে এরূপ দেখা যায় যে, কবির জীবনে যাহা কিছু ঘটে, যে আকাঙ্ক্ষা তিনি পূরণ করিতে পারেন নাই, যে দুর্দ্দমনীয় মনোবৃত্তি তিনি দমন করিতে পারেন নাই, যেখানে যে শোক পাইয়াছেন, দুঃখ পাইয়াছেন, তাহার অধিকাংশই তাঁহার চিত্তবৃত্তির মধ্যে সঞ্চিত থাকে এবং তাঁহার কাব্য-পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করে। ফরাসীলেখক Boudouin তাহার Psycho-analyse de L' Art গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, যে সমস্ত মনোবৃত্তি কবিকে নানা কারণে চাপিয়া রাপিয়া রাখিতে হয়, তাহাই তিনি রূপান্তরিত করিয়া কাব্যে প্রকাশ করেন এবং পাঠকও তাঁহার নিজের জীবনের ইতিহাসে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহারই আলোতে কাব্য পড়েন ও তাহার আনন্দ উপভোগ করেন।

"L'Art se trouve donc être, pour le contemplateur comme pour le creàture, une rèalisation imaginaire de dèsirs, et de dèsirs inconscients."—আর্ট বা রূপায়ন অজ্ঞাত ও অতৃপ্ত বাসনাকে সাংকল্পিক সৃষ্টির মধ্য দিয়া উপভোগ করে।

Boudouin তাঁহার Psycho-analysis and æsthetics গ্রন্থে কবি Verhaeren-এর জীবনের ইতিহাসে তাঁহার কাব্যের তাৎপর্য্য, অর্থ ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া তাঁহার মত সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। Freud তাঁহার Introductory lectures on Psycho-analysis গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—A true artist knows how to elaborate his day-dreams so that they lose that personal note which grates upon strangers and become enjoyable to others; he knows how to modify them sufficiently so that their origin in prohibited sources is not easily detected. When he can do all these he opens out to others the way back to the comfort and consolation of their own unconscious sources of pleasure, and so reaps their gratitude and admiration. Freud তাহার Leonardo da Vinci গ্রন্থে ভিঞ্চির সমস্ত শিল্পচাতুর্য্য Psycho-analysis-এর মতে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। Psycho-analysis-এর এই মতের বিরুদ্ধে হয়তো অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে বাস্তব জীবনের স্ফুট ও অস্ফুট ইতিহাস তাহার

আকাঙ্ক্ষা, তৃপ্তি-অতৃপ্তি, তাহার বাসনা-বেদনা যে কাব্যজীবনকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

সেই ভালো প্রতি যুগ আনে না আপন অবসান,
সম্পূর্ণ করে না তা'র গান ;
অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে।
তাই যবে পরযুগে বাঁশীর উচ্ছ্বাসে
বেজে ওঠে গানখানি
তা'র মাঝে সুদূরের বাণী
কোথায় লুকায়ে থাকে, কি বলে সে বুঝিতে কে পারে ;
যুগান্তের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে।

কৌতুকরসের মৌলিকত্ব ও বিশেষত্ব।

ডার্বীসুইপের দশটাকার টিকিটে দশলাখ টাকার প্রাপ্তিসংবাদে, কিংবা একটা ভারি মোকদ্দমায় বিপক্ষের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট হইতে ডিক্রী পাইলে, মনে যে আহ্লাদ উপস্থিত হয়, তাহা হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে না পারিলে, নাক, মুখ চোখের রন্ধ্র দিয়া যখন শুভ্রফেনের ঢেউ খেলাইয়া বাহির হইয়া যায়, তখন সে হাসির মর্য্যাদা রাখিতে হইলে বন্ধুবর্গকে মিষ্টান্নের ফরমায়েসে নাছোড়বন্দ হইতেই হয়। হাসির পরিমাণ ও স্থায়িত্ব এবং মিষ্টান্নের বরাদ্দ উভয়ই এখানে লাভের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ অতিরিক্ত মাত্রায় ধন কিংবা যশ লাভ করিলে, মনে যে সুখ লাভ হয়, তাহা বিশেষ ভাবে প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত। তখনকার যে আনন্দ তা প্রয়োজনসিদ্ধিরই আনন্দ। আনন্দের পরিমাণ অধিক হইলে যে আনন্দবার্ত্তা শ্রবণের সময়েই তাহা উচ্ছল ভাবে ছড়াইয়া পড়ে তাহা নয়, দীর্ঘদিন ধরিয়া কাজে অকাজে, সময়ে অসময়ে, ছোটখাট দুই একটা লহর মুখে লাগিয়াই থাকে। মানুষের কল্পিত ও বাস্তব প্রয়োজনের অন্ত নাই। পরীক্ষার শুভ ফল, আমদরবারি খাসদরবারী কি রায়বাহাদুরি প্রাপ্তি, নবীন যুবকের নূতন বিবাহ, দুর্দান্ত জমিদারের প্রজাদের জোটভাঙ্গা প্রভৃতি হরেক রকম প্রয়োজন আমাদের লাগিয়াই রহিয়াছে।

এই সমস্ত নানাপ্রকারের প্রয়োজনসিদ্ধিতে আমাদের হৃদয় নানাভাবে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে এবং সেই উৎফুল্লতা, উৎসাহে, অহঙ্কারে, হাসিতে, গানে, মিষ্টান্নবিতরণে ও অনভ্যস্ত দানদাক্ষিণ্যে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। এ সমস্ত ব্যাপারের আনন্দহাস্যকে আমাদের স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার কিছুই নাই, কারণ ইহা সফলতার শরীরগত বহিঃ-প্রকাশ মাত্র। সফলতার পরিচয়েই ইহার পরিচয়, ইহার অন্য পরিচয় নাই। ফলের নাম উল্লেখ করিলেই হাসির কারণ সম্বন্ধে সমস্তই বলা হইয়া যায়, আর কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ঘোড়দৌড়ে অনেক টাকা জিতিয়াছে তাই হাসিতেছে, একথা বলিলে আর এ প্রশ্ন উঠে না যে টাকা জিতিলে লোকে হাসে কেন? যদি বা ওঠে তবে তাহার উত্তরটা এই, যে জিতিলে সফলতার জন্য আনন্দ হয় এবং আনন্দমাত্রই শরীরের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে চোখমুখের পেশীর শিথিলতায়, ঔজ্জ্বল্যে ও হাসিতে আপনাকে ব্যক্ত করে। মুখের পেশীগুলির এমন কি বিশেষত্ব যে আনন্দের উদ্ভবে সেইগুলিই সর্ব্বাগ্রে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া হাসির সৃষ্টি করিয়া আনন্দকে মুখমণ্ডলে মুখরিত ও চিত্রিত করিয়া তোলে তাহা শরীরবিদেরা উত্তর করিবেন। কিন্তু এ সমস্ত স্থলে যে আনন্দে হাসিটির উৎপত্তি সে আনন্দের পিছনে প্রয়োজনসিদ্ধি ছাড়া অন্য কিছুই খুঁজিবার নাই।

আরও অনেক রকমের হাসি দেখা যায় যেগুলির পিছনে প্রয়োজন-সিদ্ধিও নাই, আনন্দও নাই। অপমানে, ঘৃণায়, ক্ষোভে, শোকে, বীরত্বেও লোককে হাসিতে দেখা যায়, কিন্তু সেখানে হাসিটা মূলভাব

নয়। দারুণ শোকেও নিরবচ্ছিন্নভাবে একটা দুঃখ উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতে পারে না, কিংবা একটা দুঃখ ঢিমা অবস্থায় অচঞ্চলভাবে জমাট বাঁধিয়া থাকিতে পারে না। একটা দুঃখ প্রধান ভাবে পড়িয়া থাকে বটে, কিন্তু সেটাকে প্রধান ভাবে উপস্থিত রাখিবার জন্য চিত্তের মধ্যে যে প্রচণ্ড আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহার ফলে দীনতা, কাতরতা, নির্ব্বেদ, লজ্জা প্রভৃতি নানা রকমের ছোট ছোট ভাবগুলি বায়োস্কোপের চঞ্চল চিত্রপর্য্যায়ের মতন নৃত্য করিতে থাকে এবং তাহারই ফলে একটি করুণ জীবন্ত শোকছবি মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে; কাজেই শোকের মধ্যে যে আমরা কখন একটা হাসি দেখিতে পাই, সেটা উদ্দাম ভাবতাণ্ডবে মুখপেশীসমূহের একটা বিকট ভঙ্গী মাত্র। কোনও ক্ষণে সেটা হাসির মত দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই হয়ত সেটা অন্তর্নিরুদ্ধ রোদনের উৎকট যন্ত্রণায় পরিণত হয়। হাসির মতন যেটাকে মনে হয়, সেটা নানাবিধ ভাবের আগম নির্গমের একটা অন্তর্ব্বর্ত্তী স্তর মাত্র। দুই একটা বাহ্যিক সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া এই গৌণহাসিকে হাসি বলা বিড়ম্বনা মাত্র। সেই জন্যই ভাষায় এই জাতীয় হাসিকে শোকের হাসি, ঘৃণার হাসি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

বগলে কুতুকুতি দিলে, লাফিংগ্যাস পান করিলে, অথবা সিদ্ধি পান করিলে, অনেক সময়ে হাসি আসে বটে, কিন্তু সেটা কৃত্রিম উপায়ে স্নায়বিক উত্তেজনার দ্বারা হাসান ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য এইরূপ কৃত্রিম এবং বাহ্যিক উপায়ে হাসিতে গেলে প্রথম প্রথম যে একটু মানসিক স্ফূর্ত্তি না হয় তা নয়, কিন্তু তাহার সহিত এমন একটা

কৃত্রিমতা ও অবসন্নতা জড়ান থাকে যে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার অস্বাভাবিকতায় আমরা উৎপীড়িত হইয়া উঠি। কৃত্রিম উপায়ে মুখাক্ষি-সঙ্কোচ ও দন্তবিকাশ করিলে হাসি হয় না, হাসির একটি স্বতন্ত্র রস আছে।

যতই হাসির এই স্বতন্ত্র রসটির উৎস আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে চাই, ততই মায়াপুরীর মধ্যে তাহা ক্রমশ অদৃশ্য হইয়া পড়ে। কোনও কৌতুকের ব্যাপারে আমরা সকলেই হাসি, কিন্তু কেন যে হাসি তাহার কারণ বলা সুকঠিন হইয়া পড়ে। খানিকটা পারদকে যেমন হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিতে গেলে তাহা অঙ্গুলের ফাঁক দিয়া শুভ্রধারায় গলিয়া বাহির হইয়া পড়ে, বুদ্ধির জালে হাসিকে ধরিতে চেষ্টা করিলেও ঠিক সেইরূপ ফল হয়। রঙ্গালয়ে একটা ভাঁড়কে অপর একটা ভাঁড়ে ঠেলা মারিলে সে যখন দিব্য একটা পিপার মতন একদিক্ হইতে অপরদিক্ পর্য্যন্ত গড়াইয়া যায়, তখন আমরা না হাসিয়া থাকিতে পারি না। ইহাতে স্বার্থ বা প্রয়োজনসিদ্ধির গন্ধমাত্রও নাই, কোনও বাহ্যিক বা কৃত্রিম স্নায়বিক উত্তেজনাও নাই, অথচ আমরা হাসি। শুধু যে তখনই হাসি তা নয়, বাহিরে আসিয়াও হয়ত যতবার সেই ভঙ্গী মনে পড়ে ততবারই হাসি। কিন্তু কেন হাসি, জিজ্ঞাসা করিলে শুধু এই উত্তর মনে আসে যে ব্যাপারটা যে ভারি হাসির। ব্যাপারটা ভারি হাসির, অথচ কেন হাসি বলা কঠিন, এই অবস্থায় কৌতুকরস বলিয়া একটি স্বতন্ত্র রসের আমরা ইঙ্গিত পাইয়া থাকি।

প্রয়োজনকে লক্ষ্য করিয়া যে আনন্দ আসে তাহাকে বুঝিতে

আমাদের কোন গোল হয় না ; কিন্তু যখন বিনা প্রয়োজনে অজস্র আনন্দ উচ্ছল হইয়া উঠে তখনই তাহার কারণ লইয়া নানা তর্ক উপস্থিত হয় এবং হয়ত তর্কের মীমাংসা হয় না।

কৌতুকের মোদকর কুতুকত্ব ও সুন্দরের হ্লাদকর সৌন্দর্য্য এ উভয়ই প্রয়োজনের দ্বার দিয়া আমাদিগকে স্পর্শ করে না। সেই জন্যই ইহাদের আনন্দ-গ্রন্থির গুটিকা যে আমাদের জীবনের কোন্ অংশে নিভৃতে নিহিত আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সেই গুটির সুতা যখন অকস্মাৎ ছাড় পাইয়া আমাদের দোল খাওয়াইয়া নাচাইয়া তোলে, তখন সেই নাচনটা শুধু আমরা টের পাই। আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা যখন করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত প্রভৃতি মূল রসগুলির আলোচনা করিয়াছেন, তখন হাস্য-রসকেও একটি মূলরস বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু রৌদ্র-রসের যেমন ক্রোধই প্রধান, বীরে যেমন উৎসাহ প্রধান, হাস্যরসের তেমন অন্য কোন স্বতন্ত্র চিত্তবৃত্তি তাঁহারা খুঁজিয়া পান নাই, তাই হাস্যরসের স্থায়ীভাবে "হাস" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যুবক যুবতীর সহিত মিলিত হইতে চায় এবং যুবতী যুবকের সহিত মিলিত হইতে চায়, তাহাদের এই মিলনেচ্ছার পূর্ণ বিকাশের পথে নানা বাধা থাকে ; তাই নানা হাবভাবের মধ্য দিয়া নানা বিলাসের বিভ্রমের মধ্য দিয়া ইহা যখন বিচিত্র আনন্দরশ্মিতে আপনাকে প্রকাশ করিতে থাকে, তখন সেই অস্ফুট বিলাস হাসির লহরে লহরে আপনাকে মুখর করিয়া তোলে। কিন্তু হাসি এখানে বাসনার ব্যঞ্জক ও দ্যোতক

মাত্র। অন্তরে যে বিলাস-বাসনার বিকাশ হইতেছে, হাসি এখানে তাহাই প্রকাশ করিয়া ভাষার কাজ করিতেছে মাত্র ; এখানে হাসি থাকিলেও হাস্যরস নাই। কারণ যে আনন্দ এখানে হাসি আনে, তাহার মধ্যে এমন কোন মৌলিকত্ব বা বিশেষত্ব নাই যে তাহাকে বিশেষভাবে হাসিরই রস বলিয়া বুঝিতে পারি। আনন্দে মানুষ হাসে এবং হাসি দেখিলে আনন্দ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি ; সেই হিসাবে হাসির সহিত আনন্দের একটা নিত্য সম্বন্ধ আছে। কিন্তু যে আনন্দে মনে কোনও ভাব বিশেষ ভাবে দাঁড়াইতে পারে না, কোনও চিন্তা আসে না, শুধু কেবল হাসিই আসে, সেই আনন্দকেই হাসির আনন্দ বলা যাইতে পারে। সৌন্দর্য্যবোধে মানুষের মনে যে আনন্দ জন্মে, তাহাতে কোন প্রয়োজন থাকে না বটে, কিন্তু সেই সুন্দর বস্তুর অংশ-বিশেষের পরস্পরের সামঞ্জস্য, কি অন্য অন্য তজ্জাতীয় সুন্দর বস্তুর সহিত তুলনা, কি সেই সুন্দর বস্তুর দ্বারা অভিব্যক্ত বা উপস্থাপিত তত্ত্বের অনুধ্যান, প্রভৃতি নানা চিন্তাস্রোতে চিত্ত ভাসিয়া চলে এবং সেই তরঙ্গের তালে তালে তার সৌন্দর্য্যকোষটি বিকশিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। এই সৌন্দর্য্য যখন শিল্প কি সাহিত্যের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করে, তখন আর তাহাকে শুধু সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিতে পাই না ; ছবির বর্ণচ্ছটা তখন চিত্তের মধ্যে নানা রসের বিচিত্র রং ফেলিয়া যে রসময়ী মূর্ত্তিকে সৃষ্টি করে তাহারই রসময় উপভোগের মধ্যে আমরা সৌন্দর্য্যের কোমল স্পর্শের আবেশ অনুভব করিয়া মোহিত হই। অশোকবনে রাবণ নিয়ন্ত্রিতা সীতার ছবি দেখিলে, রামসীতার পূর্ব্বপ্রেম, রাবণের ধৃষ্টতা,

রামের করুণ বিলাপ, সীতার দৈন্য প্রভৃতি নানারসে হৃদয় আপ্লুত হয়, এবং এই রসাপ্লবের মধ্যেই ছবিটির সৌন্দর্য্যের যথার্থ পরিচয়। ছবির বর্ণচ্ছটা এবং অবয়ব-সন্নিবেশের বৈচিত্র্য তখনই সৌন্দর্য্যপদবীর যথার্থ সার্থকতা লাভ করে, যখন ছবিকে দূরে ফেলিয়া রামসীতার করুণ রসের আস্বাদ আমাদিগকে বিভোর করিয়া তোলে। কাজেই সৌন্দর্য্যবোধের আনন্দে প্রয়োজনের সম্বন্ধ না থাকিলেও চিন্তা ও ভাবের প্রাকট্য ও প্রাচুর্য্য সম্পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু হাস্যরসের বিশেষত্ব এই, যে শুধু প্রয়োজন-সম্বন্ধ-বিরহিত্ব নয়, চিন্তা, ভাব বা প্রবৃত্তিনিচয়ের সহিতও তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। কোনও স্ফীতোদর ব্যক্তি যদি সশব্দে পিণ্ডাকারে আছাড় খাইয়া পড়ে, তবে আমরা কৌতুক অনুভব করি; কিন্তু সে আছাড়ে যদি সে এমন বেদনা পায় যাহাতে তাহার জন্য আমরা ভীত বা দুঃখিত হই, তাহা হইলে নিমেষের মধ্যেই সে কৌতুকরসের আদ্য শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন হয়। পাঁচজন ভদ্রলোক যদি কাহারও বাড়ীতে নিমন্ত্রণে উপস্থিত হন ও তাহার গৃহ-দেহলীর নবলিপ্ত আল্‌কাৎরায় যদি কোন বিশিষ্ট অতিথির মুখ কালিময় হইয়া যায়, তবে সে মূর্ত্তি দেখিলে অন্য সকলে নিশ্চয় হাসিবে, কিন্তু ভদ্র গৃহপতি তাহাতে হাসিবার ত কোনও অবসর পাইবেনই না, বরং দুঃখিত হইবেন, কারণ তাঁহার ত্রুটিই ঐ দুর্ঘটনার জন্য আংশিকভাবে দায়ী। আবার আল্‌কাৎরা-লিপ্ত ব্যক্তি যদি বিশেষ সম্ভ্রমের পাত্র হন, তবে হয় ত কোনও অতিথিই তাঁহাকে দেখিয়া হাসিবার অবকাশ পাইবেন না। যে কোনও অন্যবিধ চিন্তা, ভাব বা রস মাত্রই হাস্যরসের

শক্র। প্রয়োজনাভি-সম্বন্ধ-রহিত ভাব বা চিন্তা এবং প্রসিদ্ধ রসাদি-বর্জ্জিত যে একটি বিশেষ আনন্দধারা হাস্যোচ্ছলতার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করে, তাহাকেই আমরা বিশেষভাবে হাস্যরসের নিজস্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। এই রসটি অন্য কোনও রসের অঙ্গ নয়, অথচ ইহার আনন্দের মধ্যে এমন একটি বিশেষত্ব আছে যে অন্য রসের সংস্পর্শমাত্রেই তাহার সহিত ইহার মিলন হইয়া যায়।

সকল রসের সহিত এবং চিন্তার সহিত ইহার বিরোধ, অথচ ইহার আস্বাদের মধ্যে এমন একটু অনির্ব্বচনীয়ত্ব আছে যে হাসি ছাড়া অন্য কিছুর মধ্যেই তাহাকে ধরা ছোঁয়ার উপায় নাই। সাধারণ হাসি মনের আনন্দের বাহ্যিক অনুভব মাত্র। সে হিসাবে হাস্যকে একটা স্বতন্ত্র রস বলিয়া বর্ণনা করাটা বিসদৃশ হইয়া পড়ে। সেইজন্য সেইরকম রসকেই হাস্যরস বলা যাইতে পারে যাহার অন্য-বিলক্ষণ এমন একটা স্বতন্ত্র আস্বাদ আছে যাহা হাসির মধ্যেই আপনাকে গঠন, স্থাপন ও প্রকাশ করিয়া থাকে। এই বিশেষ রসটির মধ্যে অন্যবিধ ভাবের বা রসের অভি-সম্বন্ধ নাই বলিয়াই সংস্কৃত অলঙ্কারে ইহাকে হাস্যরস বলা হইয়াছে; এবং বুদ্ধদেব ইহাকে "হসিতুপ্পাদ" অর্থাৎ "হাসি পাওয়ার রস বলিয়াছেন।"

অন্য কোনও রসের মিশ্রণে হাস্যরস টিকিতে পারে না, এ কথা বলিলেই সন্দেহ আসে যে কথাটা খাঁটি কি না? বিশালোদর বৃষস্কন্ধ কোনও ব্যক্তি যখন আছাড় খাইয়া চিৎপাত হইয়া পড়ে, কিংবা আরসলা বা কেন্নর ভয়ে যখন কোন লোকও ঘরে দৌড়াদৌড়ি করে, তখন

আমাদের যে হাসি আসে, তাহার পশ্চাতে একটা আত্মগর্ব্ব যেন আহার পাইয়া তাজা হইয়া বসে, মনের অন্তঃপুরে খানাতল্লাসি করিলে এমন একটা ব্যাপার যেন ধরা পড়িয়া যায়। আবার যখন দীনবন্ধু মিত্রের জলধর প্রথম আলকাৎরায় চুবলি খাইয়া কাপাস-তূলা গায় মাখিয়া স্ত্রীবুদ্ধির কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া হোঁদলকুৎকৎ রূপে দেখা দেয়, তখনকার হাসির সঙ্গে একটা "যেমন কর্ম্ম তেমন ফল," তাথৈ তাথৈ করিয়া নাচিয়া উঠে। এ সমস্ত দৃষ্টান্ত দেখিলে মনে হয় যে গর্ব্বে, পাপের শাস্তিতে বা আত্মাভিমানে যে আত্মপ্রসাদের আনন্দ লাভ করা যায়, তাহাই কৌতুকের হাসির কারণ। কিন্তু একটা ছোট ছেলেকে একটা বড় টুপি মাথায় দিতে দেখিলে যে হাসি আসে তাহা জবরদস্তি করিয়াও আত্মাভিমান বা আত্মপ্রসাদের কোঠায় ফেলা যায় না। আর আত্মাভিমান বা আত্মপ্রসাদের অনুভব হইলেই যে সেটা সব সময় কৌতুকের হাসির মত হাসিতে আপনাকে পরিব্যক্ত করে একান্ত হলফ্ করিয়া বলা যায় না। কাজেই গর্ব্ব, আত্মাভিমান প্রভৃতি বৃত্তিই যে সর্ব্বপ্রকার কৌতুকরসের নিদান একথা কোনও ক্রমেই বলা চলে না। বড় জোর এইটুকু মাত্র বলা চলে যে, কোনও কোনও স্থলে কৌতুক রসের মধ্যেও গর্ব্বাদি অন্য প্রকারের আত্মতৃপ্তির যৎকিঞ্চিৎ লেপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই লেপগুলি কৌতুক রসের কারণ ত নয়ই, বরং কৌতুকরসের অবসাদক। ঐগুলি একটু বাড়িয়া গেলেই কৌতুকরস ধ্বংস হইয়া যায়। ওগুলির লেপ সত্ত্বেও যে কৌতুক রস ধ্বংস হয় না, তাহার প্রধান কারণ এই যে কোনও সময় কৌতুকের প্রাবল্যের তুলনায়

গর্ব্বাদির লেপ এত কম হয় যে, সেটুকু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও হাস্যরসের যথেষ্ট স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। আবার কোনও সময়ে বা কৌতুকের হাসির কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া গর্ব্বাদির উপরেই দায় চাপাইয়া দিয়া হাসির কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হই।

প্রায় সকল রকমে হাস্যরসের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই যে যার জন্য আমার প্রস্তুত ছিলাম না, বা যেটি আমরা ঠিক আশা করি নাই এমন একটা কিছু ঘটিয়া গিয়া আমাদের মনের গতিকে তার নিয়ত কক্ষা হইতে ঈষৎ শিথিল করিয়া দেয়।

এই শিথিলতার কথা ভাবিতে গেলেই আমাদের খেলার কথা মনে পড়ে। খেলায় আমাদের দেহ ও মনকে আমরা ইচ্ছা করিয়া তাহার অভ্যস্ত গতির কক্ষা হইতে ভিন্ন দিকে চালিত করিতে চেষ্টা করি, তখন শিথিলতা ও নূতনতায় আমরা এমন একটা নূতন উত্তেজনা, উৎসাহ ও বল সঞ্চয় করি, যাহাতে ভূগর্ভের ঝর্ণার মতন আমাদের চিত্ত আনন্দে সিক্ত হইয়া উঠে। তাই খেলার আনন্দের সন্ধান খেলায় যোগ না দিলে বুঝা যায় না। খেলায় যে লোক কোনও প্রয়োজনের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, সে আর খেলা দেখিতে পায় না। বিনা প্রয়োজনে দেহ ও মন যে আপনার চারিদিকের বাঁধনের ভিতর হইতে আপনাকে শিথিল করিতে চায় এবং শিথিল করে, সেইখানেই খেলার আনন্দ। এক হিসাবে দেখিতে গেলে এই খেলার আনন্দের সঙ্গে হাস্যরসের আনন্দের অতি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। হাসির এমন একটা স্তর আছে যেখানে তাকে খোলা প্রাণের খেলা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

ছেলেবেলা হইতে আরম্ভ করিয়া যৌবনের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত অনেকের মধ্যেই এমন একটা ধাত দেখিতে পাওয়া যায় যাহাতে তাহারা অনায়াসে তাহাদের চারিদিকের সঙ্কীর্ণগণ্ডির ভিতর হইতে একেবারে বাহিরে আসিয়া পড়িতে পারে এবং তাহাদের পুরানো মনটাকে এক ঝোঁকে একটা নূতনের ছোপে চুবাইয়া লইতে পারে। এই যে সফলতা, শিথিলতা বা সজীবতা এইটিই বিশেষ ভাবে খেলার বৃত্তি।

আমাদের ইন্দ্রিয় ও মন যখন কোন বাঁধন হইতে কোন রকমে একটু ছাড়া পায়, তখন সেই মুক্তির ফলে আনন্দ পায়। খেলার এই ছাড়াটা স্বেচ্ছাকৃত, হাস্যরস একটা আকস্মিক ঘটনা-চক্রের বৈচিত্র্য-ঘটিত। যাহার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না, যেটা যাহার সাধারণত স্বভাবগত নয়, অথবা যে-রকমটার সঙ্গে যাহা আমরা দেখিতে অভ্যস্ত নই, এমন কিছু দেখিলেই আমাদের মন তাহার প্রচলিত অভ্যাসের বন্ধন হইতে একটা নাড়া পায়। সে নাড়াটা যদি প্রচণ্ড রকমের হয়, তাহাতে মন তাহার কক্ষচ্যুত হইয়া গিয়া আঘাত পায়, এবং সেই আঘাত, ভয়, বিস্ময়, দুঃখ, বীভৎসতা প্রভৃতিতে আপনাকে প্রকাশ করে; কিন্তু সে নাড়াটি যদি অতি মৃদুমন্দ রকমের হয়, তাহা হইলে মন তাহার প্রচলিত কথার মধ্যে থাকিয়াই এমন একটা মৃঢ় মুক্ততার সাড়া পায়, যে সে অকস্মাৎ একটা আনন্দের হাওয়ায় দোল খাইয়া নাচিয়া ওঠে।

এই ছাড়্টা অকস্মাৎ ঘটে বলিয়া হাস্যরসের মধ্যে প্রায়ই একটা আকস্মিকতার গন্ধ পাওয়া যায়। আবার এই ছাড়ের মধ্যে যে একটা অজ্ঞাত মুক্তির স্বাদ আছে, সেইটুকুতে কোনও সময়ে বা একটা খেলার

মতন প্রাণখোলা ভাব, কোন সময়ে বা একটা আত্মপ্রসাদ বা গর্ব্বের ভাবও দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও সময়ে বা যে অবস্থা বা চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া হাস্যরসের উদ্রেক হয় তাহারও একটা ছোপ হাস্য-রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। যখন পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা রতা নাপ্‌তেকে ক'নে সাজাইয়া রাজীবকে মিথ্যা বিবাহে এমন করিয়া বঞ্চিত করিল যে, সে শুকরের ছানা সহিত পেঁচোর মাকে নবোঢ়া পত্নী মনে করিয়া পাল্কী চড়াইয়া নিজের প্রবীণা কন্যাদের নিকট বাড়ীতে লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল, তখন সেই বিয়ে-পাগলা বুড়োকে দেখিয়া আমাদের হাস্যরসের উদ্রেক হয়। একজন বৃদ্ধকে এমন অদ্ভুত রকমে বিয়ে-পাগ্‌লামিতে অন্ধপ্রায় দেখিলে আমাদের চিত্ত যে একটু নূতনত্ব বোধ করিয়া ছাড়্ পায় সেইটুকুই এখানকার হাস্যরসের মূল উৎস। যতই বিয়ে-পাগ্‌লার পাগ্‌লামির নূতন নূতন পরিচয় পাই, ততই এই হাস্যরসের উৎস উৎসারিত হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে "অমন লোক যে ঐ ভাবে জব্দ হয়েছে সেটা ভালই হয়েছে ভালই হয়েছে" এ-রকমের একটা ভাব জড়িত থাকে, অথবা বিয়ে-পাগ্‌লার সঙ্গে তুলনায় আমাদের নিজেদের মহত্ত্বের বা গৌরবের একটা অস্ফুট আভাসও হয়ত আমরা বোধ করিয়া থাকি। কিন্তু এগুলি হাস্যরসের মূল নিদান নয়, কেবল আনুষঙ্গিক স্বাদ মাত্র। সরবতের মূলরস শর্করার কিন্তু তারই সঙ্গে একটু অম্ল, একটু গন্ধ থাকিয়া সেই মূলরসকে বিশেষ-ভাবে স্বাদরসসমন্বিত করিয়া তোলে; তেমনি হাস্যরসের আনন্দের মূল কারণ হচ্ছে একটা নূতনত্ব, বিশ্রাম, মুক্তি; আর সেই রসের সঙ্গে

প্রতিস্থলে কৌতুকের যে একটা বিচিত্রতা আছে তার কারণ হচ্ছে প্রত্যেক আকস্মিকতার ঘটনাগত ও অবস্থাগত বৈচিত্র্য, চিত্তের প্রকৃতির অনুভবগত বিশেষত্ব এবং হাস্য-রসের সঙ্গে সমুৎপন্ন ভাব বা চিন্তাকণার কিঞ্চিৎ আমেজ। একটা মুক্তির আনন্দই হাস্যরসের মূল কারণ। সেই জন্যই অন্য কোনও রস বা চিন্তা আসিয়া পড়িলেই চিত্ত আবার বাঁধা পড়িয়া যায় এবং হাস্যরসের স্বচ্ছতা কলুষ হইয়া ওঠে। হাস্যরসের উপর একটু কণার মত যাহা ভাসিয়া বেড়াইতে পারে, শুধু ততটুকু রসান্তর, ভাবান্তর, বা চিন্তান্তরের মাত্রা যদি একটু বাড়িয়া যায়, তাহা হইলেই হাস্যরস নষ্ট হইয়া যায়। যে রকম যা কিছু আমরা সকল সময় দেখিয়া শুনিয়া থাকি, তাহাতে আমাদের মনের সেই-রকমের এমন একটা অভ্যাস জন্মায় যে কোন্ বিষয়টির সঙ্গে কোন্ বিষয়টি খাপ্ খায় তার একটা ছাপ মনের মধ্যে থাকিয়াই যায়। সে ছাপটা স্পষ্ট আকারে মনের সাম্‌নে না থাকিলেও সেটা সকল সময়ই মনের অবয়বের সঙ্গে মিশিয়া থাকে, বাহিরের জগতের সঙ্গে পরিচয়ে মনকে যখনই ক্ষণে ক্ষণে নানা পথে চলিতে হয়, তখনই সে তাহার এই অভ্যস্ত বাঁধা পথে অতি সহজেই চলাফেরা করে।

এই রকম চলিতে চলিতে যখনই এমন কিছু তার সাম্‌নে পড়ে যা তাহার এই অভ্যস্তের সঙ্গে মেলে না, তখনই এই নূতন পথে বাঁকিতে গিয়া সে দোল খাইয়া উঠে এবং এই দোলের আনন্দই হাস্যরসের মূল কারণ। যাঁহাদের মন অভ্যাসের পথে এমন দৃঢ় হইয়া গেছে যে কোনও নূতন কিছু উপস্থিত হইলে সে পথে সহসা বাঁকিতে পারে না, তাঁহারা

কৌতুককর বস্তুর উপস্থিতিতে আনন্দ না পাইয়া আঘাত পান। সেই জন্য হাস্যরসের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি সেইখানেই হইতে পারে যেখানে মনটা এমন একটা হাল্কা ভাবে থাকে যাহাতে সে অনায়াসে তাহার বাঁধা পথ হইতে অন্য পথে ঘোরা ফেরা করিতে পারে—যাহাতে ঈষৎ বাঁকিতে গেলে সে আঘাত পায় না, শুধু একটা দোলা অনুভব করে মাত্র। একটি লতা সামান্য বাতাসে ইতস্ততঃ আনন্দে নৃত্য করে, কিন্তু একটা পাথর হয় অটল হইয়া বসিয়া থাকিবে, নয় প্রচণ্ড আঘাতে উল্টাইয়া গিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে, কিন্তু কখনই দুলিবে না।

বাহিরের জগতের সঙ্গে আমাদের দিবারাত্রই সম্পর্ক চলিতেছে এবং তাহার ফলে বাহিরের জগতকে কি ভাবে, কখন কেমন করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে আমাদের চিত্তের মধ্যে সকল সময়েই তাহার একটা ইসারা রহিয়াছে। সেই ইসারাটা কোনও আইডিয়া কল্পনা বা জ্ঞান নয়, যে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে ধরা পড়িবে, সেটা আমাদের চিত্তের জীবনী-শক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত হইয়া তাহারই এক একটা বিশেষ বিশেষ প্রকার, ধারা বা ঢঙ্ হইয়া চিত্তের মজ্জায় মজ্জায় লীন হইয়া থাকে এবং চিত্তের সহিত বহির্জগতের বিশেষ বিশেষ সম্মিলন বা আদান-প্রদানের ব্যাপারের সময় আপনা-আপনি উদ্বুদ্ধ হইয়া দুইয়ের মধ্যের পরিচয়-ব্যাপারের সৌকর্য্য সংঘটন করিয়া থাকে। ইহা জীবনী-শক্তির প্রকারভূত হইয়া চিত্তের প্রাণনার সঙ্গে একেবারে মিলিয়া থাকে বলিয়া নানাদিকে পরিচয়ের নানা ইসারার বাহুল্য ও বৈচিত্র্যে বিপর্য্যস্ত হইতে হয় না। কারণ এই ইসারাগুলির স্বতন্ত্র এমন কোনও স্বরূপ

নাই যে তাহাদের বাহুল্য ও বৈচিত্র্যে মনের থলি অযথা ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িতে পারে। চিত্তের ব্যাপার যে যে ভাবে বাহিরের জগতের সঙ্গে ব্যবহারের যোগ্য হইতে পারে, সেই সেই ভাবে তাহার নানা অভ্যাস সঞ্চয় হয়; সে অভ্যাসগুলি চিত্তব্যাপারের আত্মগত প্রকার বলিয়াই সেগুলিকে চিত্ত হইতে পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা যায় না।

বহির্জগতের অনন্ত বিচিত্র ভঙ্গীর তাল অনুসারে যে ভাবে যে ভাবে চিত্ত তাহাকে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত, এ অভ্যাস বা ইসারাগুলি হচ্ছে চিত্তব্যাপারের অবগতির সেই সেই বিশেষ বিশেষ ভঙ্গী বা প্রকার মাত্র। চিত্ত যখন বাহিরের জগতের সম্পর্কে আসে এবং তাহাকে আপনার সঙ্গে মিলাইয়া লইতে চায়, তখন সে তাহার ঐ বিশেষ বিশেষ অভ্যাসকে কোনও ক্রমে এড়াইতে পারে না। যতদিকে যত রকমেই চিত্ত চলুক না কেন, সবদিকেই তাহার চলিবার একটা বিশেষ পদ্ধতি, প্রণালী বা প্রকার আছে। আমরা পথে চলিবার সময় কোনও বিশেষ ধারণা লইয়া চলি না, তথাপি আমাদের পা প্রতি ক্ষেপে এমন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাব লইয়া তাহার গতিভঙ্গীকে মানিয়া চলে যে, তাহার একটু ব্যতিক্রম হইলেই, পথে সামান্য একটু গর্ত্ত থাকিলে বা সামান্য একটু উঁচু কিছু থাকিলেই পদস্খলন নিবারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে এবং আমরা চমকিয়া উঠি। প্রতিপদক্ষেপে পা নামে উঠে, সেটা তার একটা বিশেষ ভঙ্গী, সেটা তারই গমন ব্যাপারের নিজস্ব, তথাপি তাহার মধ্যে বাহিরের জগতের সম্বন্ধে একটা বিশেষ অপেক্ষা বা ধারণা লুকান রহিয়াছে। এই যে বাহিরের জগতের সম্বন্ধে একটি বিশেষ

অপেক্ষা বা আশা, ইহাতেই অজ্ঞাতে পায়ের গতিভঙ্গী স্বভাবত নিয়ন্ত্রিত ও নির্দ্দিষ্টক্রমে ব্যাপারিত হইয়া চলিয়াছে। পায়ের গতিভঙ্গীর মধ্যে যতটুকু চলন, ততটুকু পায়ের জীবনীশক্তি; কিন্তু যতটুকু তাহার চাল, তাহার রকম, ঢঙ্ বা প্রকার, তাহার সমস্তটুকুই বাহিরের জগৎসম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট অপেক্ষা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের সঙ্গে যখন বাহিরের জগতের কোনও সম্পর্ক ঘটে, তখনই বাইরের জগৎ সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট অপেক্ষা বা ধারণা লইয়া চিত্ত তাহার সন্মুখীন হইতে চায় সেইটিই তাহার অভ্যাস, চাল, ঢঙ্ বা প্রণালী। এই অভ্যাসের পথ হইতে কোনও আকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় মন যদি একেবারে অন্য একটা জায়গায় ছিটকাইয়া পড়ে তাহা হইলে মনে যে পীড়া জন্মে, নানা ভাবে তাহার আঘাত আমরা অনুভব করিতে পারি। কিন্তু অভ্যাসের পথ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হইয়া যদি সামান্য একটু নাড়া মাত্র পায়, তাহা হইলেই সেই নাড়াটুকুকে এড়াইয়া আপন স্বাভাবিক অভ্যাসের পথে আবার স্থির হইয়া দাঁড়াইবার জন্য অন্তঃপুর হইতে যে জীবনীশক্তির স্রোত আসিয়া স্বভাব গতিতে উপচিত হয়, সেইটিই হচ্ছে কৌতুক-রসের মূল নিদান এবং সেই জন্যই চিত্তকে নূতন করিতে, সঞ্জীবিত করিতে, তরুণ করিতে কৌতুকের এত প্রয়োজন। যদি আকস্মিক ঘটনার প্রাধান্য এমন হয় যে চিত্ত তার অভ্যাসের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও অন্তঃপুরের জীবনীশক্তির ভাণ্ড হইতে নূতন রস নির্গত হইয়া আসে, কিন্তু আঘাতকে নিরাময় করিবার জন্যই সেটুকু ব্যয় হইয়া যায়, সেইজন্য তাহার একটুখানিকেও আমরা তহবিলে জমা

দেখিতে পাই না। কিন্তু সামান্য নাড়াতে সে রস আসিয়া জমে, নাড়াটুকু সাম্‌লাইতে তাহার অতি অল্পই খরচ হয়। কাজেই সেখানে আমরা খানিকটা উচ্ছল জীবনী-শক্তির আস্বাদ পাই এবং এই আস্বাদই কৌতুকরসের আস্বাদ। এই জীবনীশক্তির প্রকাশ ও প্রভাব কেন যে মুখের পেশীগুলির উপর বিশেষভাবে কাজ করিয়া হাসির সৃষ্টি করে, সেটা শরীরতত্ত্ববিদের অনুসন্ধানের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু আমাদের প্রবন্ধের সঙ্গে সে বিচারের কোনও সম্পর্ক নাই। আমরা শুধু এই দেখিতে পাই যে আমাদের বিচিত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে চারিদিক্ দিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে আমাদের যে যোগ ঘটিতেছে তাহার যেখানেই আমরা একটি অপ্রত্যাশিত সমাবেশ দেখিতে পাই, যাহাতে আমাদের পথে সামান্য একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি মাত্র, কিন্তু কোন দারুণ আঘাত বা বিচ্যুতি সহ্য করিতে হয় না, সেইখানেই কৌতুকরসের সৃষ্টি। খুঁটিনাটির দিক দিয়া আমাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র যেমন বহুধা-বিচিত্র, তাহার কোনও ইয়ত্তা করা যায় না, তেমনি কোন্ কোন্ দিক দিয়া যে কেমন করিয়া কি কৌতুকরস সৃষ্টি হইতে পারে তাহারও কোন ইয়ত্তা করা যায় না।

একটা ছোট গাছে প্রকাণ্ড ফল দেখিলে হাসি পায়, বামন দেখিলে হাসি পায়, কুঁজো কিংবা বাঁকা মানুষ দেখিলে হাসি পায়, কিংবা যদি একটা মানুষকে আছাড় খাইয়া ফুটবলের মতন গড়াইতে দেখা যায় তাহাতেও হাসি পায়। মেমেরা বাঙ্গালির মেয়ে দেখিয়া হাসে; আবার বাঙ্গালী মেয়েরা হয়ত মেম দেখিয়া হাসে। ঢাকার কথা

শুনিয়া বরিশালের লোকে হাসে, আবার বরিশালের কথা শুনিয়া ঢাকা হাসে, আর সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গের কথা শুনিয়া পশ্চিম বঙ্গ হাসে। হাসি যে কতরকম থাকিতে পারে তাহার কোনও ঠিকানাই পাওয়া যায় না, এবং সমস্ত জায়গাতেই দেখিতে পাই যে একটা অপ্রত্যাশিত বস্তুতে যে একটা নূতনত্বের চাঞ্চল্য আসে তাহাতেই হাসি আসে; তাহার মধ্যে নিজেকে বড় মনে করার ভাব বা দুষ্ট-ব্যক্তিকে কর্ম্মোচিত প্রতিফল পাইতে দেখায় স্ফূর্ত্তি লাভ করা যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা কৌতুক-রসের নিজস্ব নয়। যখন মানিকপীরের গান শুনি যে—

কত কেরামত জান রে আল্লা, কত কেরামত জানো,
হুঁকোর মধ্যে পানি ভইরে গর্‌গরিয়ে টানো।

তখন আমরা যে হাসি, তাহাতে নিজের বাহাদুরির কোন লেশ আছে বলিয়া ত কিছুতেই মনে হয় না। মুসলমানি কথা এবং হুঁকার গড়গড়ানি শব্দে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের পরিচয়, শুধু এই কথাতেই হাসি আসে। দেবগণের মর্ত্তে আগমন গড়িয়া যখন দেখা যায় দেবতারা মানুষের মতম দরদস্তুর করিতেছেন, গাড়ী চড়িতেছেন, চিঁড়ে দই খাইতেছেন, তামাক খাইতেছেন, তখন আমরা না হাসিয়া থাকিতে পারি না। আবার যদি পড়ি যে এখানকার কোন রায়বাহাদুর C. I. E. স্বর্গে গিয়ে সেখানে মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন, এবং এজিটেশনের ব্যবস্থার উদ্যোগ করে, তাহা হইলেও আমাদের হাসি আসে। শুধু ছন্দেতে যে হাসি আসিতে পারে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানে তার যথেষ্ট

পরিচয় পাওয়া যায়। গদ্যের মতন চলিতে চলিতে হঠাৎ পদ্য হইয়া গেল, কিংবা পদ্য চলিতে চলিতে হঠাৎ গদ্য হইয়া গেল, অথবা পদ্যের মধ্যে এমন দুএকটা শব্দ পাইলাম যাহা গদ্যেই আমরা সাধারণত দেখিয়া থাকি। তাহার সঙ্গে কল্পনার উল্টাপাল্টা ত আছেই এবং মধ্যে মধ্যে শ্লেষ বা Punning চলিতেছে :—

চল্ল লুপমেল—ইংরেজের খেল
হাওয়ার! যেন উড়ে, ধোঁয়া বালি ছুঁড়ে
দূরের জিনিষ কাছে এনে, কাছের ফেলে দূরে—
যেন তাহার খেলা। ছোট টিশন মেলা
ছাড়িয়ে ত অবিলম্বে এল শ্রীরামপুরে।
সেখানে একটু থামিয়ে, যাত্রী তুলে নামিয়ে
হাঁপাতে হাঁপতে আবার চলে দ্রুতগামী এ।
জ্ঞান নাইকো দাদার আলো কিংবা আঁধার,
করে নাও দৃষ্টি ঝঞ্ঝা কিংবা বৃষ্টি,
ঊর্দ্ধশ্বাসে উড়ে পাহার জঙ্গল ফুঁড়ে
টড়া টক্ টড়া টক্ টড়াটক টড়া ধারামতে
ছাড়াল যে কত ষ্টেশন পারি নাইক গণিতে।

আবার—

ব্যারিষ্টার-উকিলাদি মহাযজ্ঞী সমাধিলা।
ভারতে ভারী অদ্ভুত আশ্চর্য্য মহতী সভা॥

আসিলা সে মহাযজ্ঞে মহারাষ্ট্রীয় পশ্চিমে,
মাদ্রাজী উড়িয়া শিখ বাঙ্গালী চ দলে দলে ॥
কাহারো পরণে ফুর্ত্তি, কাহারো উড়নি উড়ে,
কাহারো বা ঝুলে চাপ্‌রাস, কাহারো সাহেবী ধড়া ॥
কাহারো সম্মুখে টেড়ী, কাহারো পিছনে টিকি,
কাহারো উপরে ঝুটি, কা কস্য পরিদেবনা ॥
এরূপ বিবিধা মূর্ত্তি সমাগত সভাতলে
বক্তৃতা করিয়া বাবা লড়াই করিতে ফতে ॥
তন্মধ্যে মুখসর্ব্বস্ব বাঙ্গালী হি পুরোহিত
রেজুলেসন-নির্ম্মাণে বক্তৃতার মহারথী ॥

* * *

পরিশেষে সভাতলে সবাই অপরাজিত,
দিলে হি বক্তৃতা চোটে উড়াইয়া পরস্পরে ॥
বাঙ্গালী-মহিমা-কীর্ত্তিকলাপ-কাহিনী যদি
শুন মন দিয়া বাপু পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।

আবার

* * *

জান নাকি কদাচন মূঢ়
কর্ণ-বিমর্দ্দন-মর্ম্ম কি গূঢ় ?
কর্ণ-দিবার কি কারণ অন্য
যদি না তা আকর্ষণ জন্য ?

বাবা ! সে দশ ইঞ্চি প্রস্থে
বিপুল বিশাল প্রকাণ্ড হস্তে
শূকর-গো-মৃগ-মাংসে-পুষ্ট
আছে রক্ষা হইলে রুষ্ট ?
কর্ণাকর্ষণ অতিশয় তুচ্ছ
যা কর সাহেব নারিব পুচ্ছ।

লঘু বিষয় লইয়া যে বাংলাতে সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ করিতে যাওয়া হইয়াছে তাহাতে জিনিষটা হাল্‌কা হইয়া গিয়া হাসি জমাইতেছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে, স্থানে স্থানে উপহাসের ও শ্লেষের রসেরও বেশ মিল আছে।

আবার

পারো ত জন্মোনা কেউ বিষ্যুৎবারের বারবেলা,
জন্মাও ত সাম্‌লাতে পারবে নাকো তার ঠেলা।
দেখ, বিষ্যুৎবারের বার বেলায় আমার জন্ম হইল ;
তাই দিল মোরে, কালো ক'রে রোদে ধরে
মাখিয়ে মাখিয়ে তৈল।

এখানে বিষ্যুৎবারের বারবেলার প্রতি কুসংস্কারের ঠাট্টাটি ছন্দের জোরে চমৎকার জমিয়া উঠিয়াছে।

আবার "বদ্‌লে গেল মতটা" তে কোরাসের গন্ধ ঢঙের ঝোঁকটাতেই সমস্ত হাসিটা জমাইয়া রাখিয়াছে।—

ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা।
কোরাস—অমন অবস্থাতে পড়্‌লে সবারই মত বদলায়॥

বসন্তে বিরহিণীদের বিরহ-যাতনা বাড়ে এটার সঙ্গে সাহিত্যে আমরা সুপরিচিত কিন্তু শুধু ছন্দের ঢঙের বর্ণনার অদ্ভুতত্বে ও বিরহ-বিনোদনের অদ্ভুত উপায়ে কি সুন্দর হাস্য রসের সৃষ্টি করিয়াছে।

দেখ্‌ সখি দেখ্‌ চেয়ে দেখ্‌ বুঝি শিশির হইল অন্ত
বুঝি বা এবার টেঁকা হোল ভার সখি রে এল বসন্ত।
বহিছে মলয় আকুলি বিকুলি,
রাস্তায় তাই উড়ে যত ধূলি,
এসময় আহা বিরহিণীগুলি কেমনে রবে জীবন্ত!
ঝর ঝর ঝর কুল কুল কুল বহে ঘাম সব গাত্রে,
ভন্‌ভনে মাছি দিনের বেলায় শন্‌শনে মশা রাত্রে;

পতি কাছে নাই, পতি বিনে আর কে আছে নারীর সম্বল?
কাঁচা আম দুটো পেড়ে আন্‌ সখি, গুড় দিয়ে রাঁধি অম্বল।
নিয়ে আয় পান, তাস্‌ আন ছাই—বিরহের এত জ্বালা ম'রে যাই!
দাঁড়াইয়া কেন হাসিস্‌ লো ভাই বাহির করিয়া দন্ত।

আবার শুধু একটা অদ্ভুত হাসি টানিয়া আনিতে পারে—

যেমন বুদ্ধি তেমন বিদ্যে
যেমন গরু টানে গরুর গাড়ী।

কিংবা

রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে
স্বপ্নে মুই দেখি তোরে, তার পরে ঘুম ভেঙ্গে ওরে
উঠে যেয়ে পড়ি মেঝেয় ধরাস করে
কলাগাছ পড়ে যেমন চৈতির কি আশ্বিনের ঝড়ে!

আবার বিরহের বর্ণনায় যখন পড়ি

তোমার বিরহে সইরে দিবানিশি কত সই?
কি বলিব আর পরিত্যাগ (এখন) একেবারে চিড়ো দই—
রোচে নাকো মুখে কিছু পাঁঠার ঝোল আর লুচি বৈ।
এখন সকাল বেলা উঠে তাই, হতাশ ভাবে সন্দেশ খাই,
বিরহেতে দিনে দিনে ওজনেতে ভারী হই।

তখন এই উল্টা বর্ণনাতে না হাসিয়া পারা যায় না। আবার বাঙ্গালার "দেদারের" সঙ্গে ইংরাজী "ফেদার" মিলানোতে হাসি আসে। এমনি যেটা পড়িলে হাসি আসে না, ঢঙ্ করিয়া সেটা পড়িলে না হাসিয়া থাকিতে পারা যায় না।

যেমন "অয়ি ময়ি মানিনি মা কুরু মানং"।

খাওয়ার জিনিষকে কখনও কাব্যরসের বিষয় করা হয় না। কিন্তু

ভাল খাবার যদি কাহারও মনে কবিত্ব-প্রেরণা জাগাইয়া তোলে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ হাস্যরসের সৃষ্টি হয়।

উহু সন্দেশ বুঁদে গজা মতিচুর রসকরা সরপুরিয়া
উহু গড়েছ কি নিধি, দয়াময় বিধি! কত না বুদ্ধি করিয়া।
যদি দাও খালি—আঃ
মদীয় বদনে ঢালিয়া,
উহু কোথায় লাগে কর্ম্মো কাবার, কোথায় পোলাও কালিয়া!
উহু খাই তা হলে চক্ষু মুদিয়া, চিৎ হইয়া, না নড়িয়া।
আহা ক্ষীর হোত যদি ভারত-জলধি, ছানা হত হিমালয়,
আহা পারিতাম পিছু করে নিতে কিছু সুবিধা হয়ত মহাশয়।
আবার এর Tragic endটি আরো চমৎকার—
ওহো না খেতেই যায় ভরিয়া উদর, সন্দেশ থাকে পড়িয়া;
ওহো মনের বাসনা মনে রয়ে যায়, চক্ষে বয়ে যায় দরিয়া!

কত রকমে যে সাহিত্যে হাস্যের সৃষ্টি হইতে পারে, একরকম এলো মেলো ভাবে উদাহরণ তুলিয়া তাহার কোনও কিনারা করা যাইবে না। কৌতুকরসের সুর বিভাগ করিতে গেলে হয় ত শব্দগত, কাব্যগত, ছন্দগত, বিপরীতভাবে সমাবেশগত কি চরিত্রগত, বাহ্যিক আকার, প্রকার কি চাল-চলনগত, এমনি অনেক প্রকারের বিভাগ করা যাইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বত্র এইটুকু চাইই যে একটি নূতন রকমের কিছু আনিয়া তাহার অপ্রত্যাশিত আঘাতে মনকে তাহার অভ্যাস

দশার সুপ্তি হইতে জাগাইয়া তুলিবে। শ্রীমতী বিলাসিনীর উচ্চ শিক্ষার গর্ব্বে স্বামীকে ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাট্‌না বাটা এবং রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত করা ব্যাপারটা এই "পতিই পরমগুরু দেশে" অবরোধের দেশে যে নিতান্ত কৌতুককর হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি; কিন্তু এই জিনিষটাই যদি অন্য দেশের অনুরূপ সামাজিক অবস্থাতে ঘটিত তাহা হইলে হয়ত তাহাতে কিছু হাসির কারণ থাকিত না। একটু আকস্মিকতায় এমন মৃদু আন্দোলন যাহাতে অন্য কোন ভাব বা চিন্তা জমিয়া উঠিতে না পারে, অথচ মনটা একটু দোল অনুভব করিয়া জাগিয়া ওঠে, —এইটুকই হচ্ছে কৌতুকরসের বিশেষত্ব, এই জন্যই অন্য রসের মতন এ রসকে ধরা ছোঁয়া সহজ নহে। আকস্মিকতাই বলি, আর নূতনত্বই বলি, কোনটাতেই হাসির সেই নূতনত্বকে বুঝাইতে পারে না। কারণ, হাসির যথার্থ কারণ হচ্ছে নূতনত্বের মৃদু উত্তেজনায় চিত্তের স্বভাবিক নিয়ন্ত্রিত গতির কক্ষ থেকে একটু মুক্তি, একটু আল্‌গা ভাব এবং তাহার ফলে জীবনী শক্তির স্বচ্ছ প্রবাহের একটা অজস্র উপচয়। হাসি সেইজন্য শুধু মনের ক্লান্তি দূর করে না, দেহেরও ক্লান্তি দূর করে এবং দেহকে কার্য্যক্ষম করে। W. J. Cromie বলিয়াছেন—

"Laughing is an exercise which aids digestion. Laugh and grow fat. A merry heart doeth good like a medicine. Laughing stirs up the abdominal organs and increasing the circulation of the blood it aids peristalsis and causes the flow of the juices etc.,

needed in digestion. Take a five minute's dose of laughter after each meal."

হাসি নানা কারণেই হইতে পারে। কিন্তু অন্য হাসির সহিত কৌতুকের হাসির তফাৎ এই যে অন্য হাসিতে লাভ, ক্ষতি, দম্ভ, অভিমান, প্রতিহিংসা প্রভৃতি নানা প্রয়োজনের সম্পর্ক রহিয়াছে। কিন্তু কৌতুকের হাসি অনিমিত্ত হাসি, এ হাসি আমরা নিজের উপর হাসি, পরের উপর হাসি, বাস্তব ব্যাপারেও হাসি, সাহিত্যের কাল্পনিক ব্যবস্থায় হাসি, শব্দের ঝঙ্কারে হাসি, কথার সুরে হাসি, অনেক সময় কিসে হাসি তা জানিনা তবু হাসি, এ হাসি আমরা ইচ্ছা করিয়াই হাসি না, বরং অনেক সময় হাসি চাপিতে চেষ্টা করিলেও চাপিতে পারি না। বলি যে দম ফেটে যায়, ভারি হাসি পাচ্ছে, কিছুতেই চাপা যাচ্ছে না। এর জোর এমন বেশী যে অন্য রসের মতন এ উপভোগের ইচ্ছা বা চেষ্টার অপেক্ষা করে না, জীবনীশক্তির যে উচ্ছল প্রবাহ আরম্ভ হয় তার ভাগু উপভোক্তার নিজের হাতে নেই। চিত্তের অজ্ঞাতে আসিয়া যেই কোনও ঘটনা আকস্মিক সন্নিবেশ-বৈচিত্র্যে জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তিকে আঘাত দিয়া সঞ্চালিত করিয়া তোলে অমনি কৌতুকরসের অনুভবের সৃষ্টি হয়। অন্য রসের বেলা দেখা যায় তাহারা যখন সাহিত্যে বা শিল্পে স্থান পায় তখনই তাহারা ব্যবহার ক্ষেত্র এড়াইয়া অলৌকিক এবং অনিমিত্ত হইয়া উঠে, কিন্তু কৌতুক-রসের বিশেষত্ব ও স্বভাবই এই যে, এ সব সময়ই অনিমিত্ত ও প্রয়োজন-বিহীন, লাভ ও ক্ষতি নিরপেক্ষ। প্রয়োজনের চাতুরী বা

পাটোয়ারী বুদ্ধির তাড়নায় যখন মন কলুষিত হইয়া উঠে, কৌতুকরসের খানিকটা সেখানে ছিটাইয়া দিতে পারিলে তখনই মন তাজা হইয়া ওঠে, এবং প্রয়োজনের উপরে উঠিয়া জীবনের যথার্থতার কেন্দ্রের একটু আভাস পায়। কৌতুকের দেবতা হচ্ছে প্রাণ, যে হাসিতে পারে তার এ সংসারে ভয়ের কারণ কম। যতই ময়লা জমুক না কেন, যে খানিকটা হাসিতে পারে তার সেখানেই অনেকখানি ভার লঘু হইয়া যায়। তাই আর কিছুও যদি আমরা না পারি, তবু হাসির লহর তুলিয়া উচ্ছল আনন্দে যদি মনকে নাচাইয়া তুলিতে পারি তাহা হইলেও জীবনটা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভবনা থাকে না।

১৫৭৪